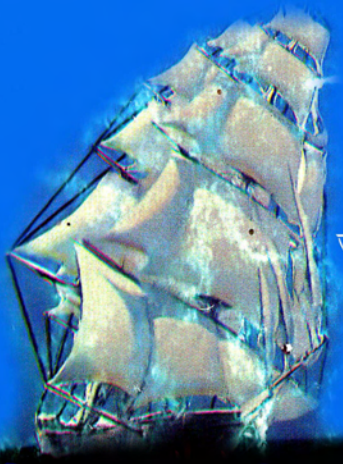

জুল ভার্নের স্কুল ফর রবিনসন্স

অনুবাদঃ শামসুদ্দীন নওয়াব

জুল ভার্নের

স্কুল ফর রবিনসন্স

শামসুদ্দীন নওয়াব

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-3153-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
জি পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SCHOOL FOR ROBINSONS
Jules Verne
Trans by Shamsuddin Nawab

সেবা প্রকাশনী

সাতাশ টাকা

জুল ভার্ন

ইতিহাস, ভুগোল ও বিশেষ করে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে, তার সাথে অপূর্ব কল্পনার রঙ মিশিয়ে আশ্চর্য সব রোমাঞ্চ-কাহিনী রচনা করে গেছেন জুল ভার্ন। 'ফাইভ উইকস ইন আ বেলুন,' 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লীগস আন্ডার দ্য সী', 'ফ্রম দি আর্থ টু দ্য মুন', 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ', 'জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দি আর্থ', 'মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড', ইত্যাদি অমর সৃষ্টি তাঁকে এনে দেয় বিশ্বজোড়া খ্যাতি। কাহিনীর রস ও আমেজ কোনভাবে ক্ষুণ্ন না করে বিশালাকার মূল রচনাগুলোকে কিছুটা সংক্ষেপ করে রূপান্তরিত করা হয়েছে বাংলায়।

১৮২৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের বিস্কে উপসাগরের ফায়েদ্যু দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন জুল ভার্ন। মারা যান ১৯০৫ সালের ২৪ মার্চ। ভিক্টর হুগো প্রভৃতি অমর সাহিত্যিকদের যে সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল, অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর জন্য ফ্রেঞ্চ আকাদেমি সেই একই সম্মানে ভূষিত করেছিল জুল ভার্নকে।

সেবা প্রকাশনী থেকে
জুল ভার্নের আরও কটি বই

কানপুরের বিভীষিকা, প্রপেলার আইল্যান্ড, লাইট হাউজ ও ক্লিপার অভ দ্য ক্লাউড্স্।

প্রজাপতি প্রকাশন থেকে
ক'টি বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী

কাজী মায়মুর হোসেন

গ্রহান্তরের আগ্রাসন।

কাজী শাহনূর হোসেন

সবুজ মানব, মরা মানুষের শহর, অশুভ পিরামিড, গুহামানবের কবলে, সাগরপিশাচ, মৃত্যু-রোবট, মহাকাশে বন্দী, অন্ধকূপের রহস্য, আঁধারের আততায়ী, কয়লাখনির আতঙ্ক, বন্ধকারখানার রহস্য, জলাভূমির ভয়ঙ্কর, পাতাল বিভীষিকা।

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

অশুভ শক্তি।

জুল ভার্ন/শামসুদ্দীন নওয়াব

বেগমের রত্নভাণ্ডার, বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ, রহস্যের দ্বীপ, মাইকেল স্ট্রগফ, নোঙর ছেঁড়া, সাগর তলে, কার্পেথিয়ান দুর্গ, গুপ্ত রহস্য, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, চাঁদে অভিযান, নাইজারের বাঁকে, মরুশহর, মাস্টার অভ দ্য ওয়ার্ল্ড, আশি দিনে বিশ্ব ভ্রমণ, পাতাল অভিযান, ব্ল্যাক ডায়মন্ড।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

'...হ্যাঁরে ভাই, তবে আর বলছি কি! এবার নিলামে তুলেছি একটা দ্বীপ! সত্যিকার দ্বীপ! আস্ত একটা দ্বীপ!' নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করল নিলামদার উী ফেলপর্গ। 'হে-হে-হে, ফেলুন কড়ি মাখুন তেল! সবচেয়ে বেশি দামটা হাঁকুন, নগদ টাকায় আপনার কাছেই বেচা হবে দ্বীপটা। যার পকেট গরম তিনিই এই দ্বীপ কিনতে পারবেন।'

অকশন হাউসে তিল ধারণের জায়গা নেই এরকম একটা অদ্ভুত বেচা-কেনা দেখতে দলে দলে ভিড় করেছে মানুষ। ভিড় হলে হৈ-হট্টগোলও হবে, হচ্ছেও তাই–যাকে বলে নরক একেবারে গুলজার! এত শোরগোলের মধ্যে বৃত্তাকার মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা ফাটাচ্ছে জিনগ্রাস জিনগ্রাস ফেলপর্গের সহকারী। হৈ-হট্টগোলের শব্দকে ছাপিয়ে তার গলা অকশন হাউসের প্রতিটি কোণ থেকে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। 'দাম হাঁকুন, ভাই, দাম হাঁকুন!' চিকন গলা জিনগ্রাসের, এত তীক্ষ্ণ যে কানের পর্দা না ফুটো হয়ে যায়। তার চিৎকার শুনে দশ নম্বর স্যাক্রামেনটো স্ট্রীটের অকশন হাউসে আরও লোকজন ভিড় করছে। 'আস্ত একটা দ্বীপ নিলামে চড়েছে। গেল গেল গেল, এই বুঝি বিক্রি হয়ে গেল! দেরি করলে ঠকবেন, তাড়াতাড়ি নিলামে যোগ দিন। পকেট গরম থাকলে আপনার ভাগ্যেও শিকে ছিঁড়তে পারে! আস্ত দ্বীপ, ভাই, আস্ত একটা দ্বীপ!'

নিলাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী সানফ্রান্সিসকোয়। লিমা, সান্টিয়াগো, ভালপারাইসো–এই তিন বন্দর নগরীকে পিছনে ফেলে ইদানীং সানফ্রান্সিসকোই শহর ও বন্দর হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। নিলামে যারা যোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে উটাহ, অরেগন আর ক্যালিফোর্নিয়ার লোকজনই বেশি। মেক্সিকো আর চীনের কিছু লোকও আছে। উপকূল থেকে এসেছে দু'একজন কানুক, ট্রিনিটি নদীর তীর থেকে এক-আধজন ব্ল্যাক-ফ্লিট। এমন কি গ্রসভেনট্রেস আর ফ্ল্যাটহেড থেকেও দু'একটা নমুনা হাজির। সব মিলিয়ে যত লোক ভিড় করেছে, তার ছয়ভাগের একভাগ হলো ফরাসী।

দিনটা আজ পনেরোই মে। সময়টা এখনও হাড় কাঁপানো শীত। কিন্তু অকশন হাউসের ভিড় দেখে শীত লেজ তুলে পালিয়েছে, গরমে হাঁসফাঁস করছে সবাই। লোকজন ভিড় করেছে ঠিকই, কিন্তু সবাই তারা নিলামে অংশ নিতে আসেনি। আসলে প্রায় সব লোকই এসেছে মজা দেখতে। মানুষের মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। এরকম কথা কেউ কখনও শুনেছে যে একটা দ্বীপ নিলাম হবে! আর নিলামে চড়লেই যে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপ কেউ কিনতে চাইবে, এমন পাগল কে আছে? টাকার প্রশ্নটাই মুখ্য নয়, টাকা তো অনেক লোকেরই আছে। কিন্তু সরকার খেপেছে বলে কি টাকাঅলারাও খেপবে? লোকে বলাবলি করছে, সবচেয়ে কম দাম যেটা ধরা হয়েছে তা-ও ওঠে কিনা সন্দেহ। দ্বীপটা কিনতে তেমন কেউ আগ্রহী হবে না বলেই নিলামদার এত হাঁকডাক ছাড়ছে। লোকের ধারণাই সত্যি হলো। নিলামদারের কথা শুনে হাসাহাসি করছে সবাই। তাদের মধ্যে একজনকেও দ্বীপ কিনতে উৎসাহী বলে মনে হলো না।

'গেল গেল গেল, এই বুঝি বিক্রি হয়ে গেল! পানির দরে, ভাই

রে, পানির দরে। মস্ত একটা দ্বীপ! আস্ত একটা দ্বীপ! জীবনে এরকম সুযোগ একবারই আসে। এই সুযোগ হেলায় হারাবেন না।' আবার গলা ফাটাচ্ছে জিনগ্রাস।

'গেল গেল করছে বটে, কিন্তু যাচ্ছে না,' ব্যঙ্গ করল এক আইরিশ। লোকটার পকেটে দ্বীপ কেনার টাকা তো দূরের কথা, একটা নুড়ি পাথর কেনার পয়সাও আছে কিনা সন্দেহ।

'সস্তা, সস্তা, একেবারে পানির দর,' চিৎকার করছে নিলামদার। 'এক একরের দাম পড়বে ছয় ডলারেরও কম...'

'কিনলে ঠকে ভূত হতে হবে,' প্রকাণ্ডদেহী এক চাষী বলল। জমিজমার দরদাম সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে সে। 'ওই জমি থেকে কেনা দামের আটভাগের একভাগও তোলা যাবে না।'

'শুনুন, ভাই, শুনুন! মন দিয়ে শুনুন! লোভনীয় এই দ্বীপের আয়তন কমবেশি চৌষট্টি বর্গমাইল, সব মিলিয়ে দুশো পঁচিশ হাজার একর জমি পাচ্ছেন...'

'সে জমির ভেতরটা কেমন, তাই বলো! শক্ত, নাকি নড়বড়ে?' এবার জানতে চাইল একজন মেক্সিকান। মদের দোকানে নিয়মিত আসা-যাওয়া আছে তার। দ্বীপটা নড়বড়ে কিনা জানতে চাইছে, অথচ এই মুহূর্তে তার নিজের ভেতরটাই নড়বড় করছে।

'সবুজ গাছপালায় ভরা ভারী সুন্দর একটা দ্বীপ। ঘাসে মোড়া জমি, পাহাড়, ঝরনা–কী নেই!'

'দ্বীপটা টিকবে তো?' একজন ফরাসী জানতে চাইল।

'বাহ্, কেন টিকবে না, একশো বার টিকবে!' হাসিমুখেই জবাব দিল ফেলপর্গ। দীর্ঘকাল নিলাম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সে, যে যতই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করুক, আজকাল আর ভুরু কোঁচকায় না।

'তাহলে বলুন, কতদিন টিকবে? খুব বেশি হলে দু'বছর, তাই না?'

'যদি বলি দু'কোটি বছর টিকবে, তা-ও সঠিক উত্তর হয় না। বলা উচিত এই পৃথিবী যতদিন আছে, দ্বীপটাও ততদিন থাকবে।'

'আচ্ছা!'

'এমন দ্বীপটি কোথাও তুমি পাবে না কো খুঁজে। কি, ঠিক বলিনি, জিনগ্রাস?' জিনগ্রাস মাথা ঝাঁকাল। 'এ এমন একটা দ্বীপ যেখানে কোন মাংসখোর জন্তু নেই। নেই কোন বুনো জানোয়ার বা সরীসৃপ...'

'কিন্তু পাখি? পাখিও নেই?' জানতে চাইল ভবঘুরে এক বাউণ্ডুলে।

আরেকজন গলা লম্বা করে বলল, 'আমি পোকা সম্পর্কে জানতে চাই। দ্বীপটায় কি পোকামাকড়ও নেই?'

'যার পকেট গরম, এই দ্বীপ তার কপালেই জুটবে,' আবার প্রথম থেকে শুরু করল ডীন ফেলপর্গ। 'আসুন, ভাই, আসুন। পকেটের অবস্থা বুঝে সামনে পা বাড়ান। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো একটা মনকাড়া দ্বীপ। কোন ঝামেলা নেই, মেরামত দরকার হয় না, অত্যন্ত উর্বর। এই দ্বীপ আগে কেউ কখনও ব্যবহার করেনি। এক কথায়, সম্ভাবনাময় দ্বীপটার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। গেল গেল গেল, এই বুঝি বিক্রি হয়ে গেল! পানির দাম, ভাই, পানির দাম! এগারো লাখ ডলার দাম ধরা হয়েছে! এরচেয়ে সস্তা আর কি আশা করেন! এগিয়ে এসে হাত তুলুন, ভাই, হাত তুলুন! কিনতে চাইলে হাঁকুন দাম। প্রথমে কে দাম বলবেন...আপনি? আপনি? নাকি আপনি? ওই কোণে বসে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন– ও ভাই, ভয় কি, সাহস করে বলে ফেলুন একটা দাম। ভুলে যাবেন না, আপনি একটা দ্বীপের গর্বিত মালিক হতে যাচ্ছেন! আস্ত একটা দ্বীপ, ভাই!'

'নাহয় কিনবই,' বলল এক লোক, 'কিন্তু জিনিসটা না দেখেই

কিনে ফেলব? আপনার দ্বীপটা একবার আমার হাতে দিন না, নেড়েচেড়ে দেখি!' সে যেন একটা ফুলদানি কিনতে চাইছে।

লোকটার কথা শুনে ঘর ভর্তি লোক গলা ছেড়ে হেসে উঠল। এখনও কিন্তু কেউ কোন দাম হাঁকেনি।

নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে দ্বীপটা কারও হাতে তুলে দেয়া গেল না ঠিকই, তবে কৌতূহলী খদ্দেরের জন্যে দ্বীপের একটা মানচিত্র রাখা হয়েছে। সেটার ভাঁজ খোলা হতেই লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ক্যালিফোর্নিয়ায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ছাড়াও সাময়িকপত্রের সংখ্যা এত বেশি যে গুনে শেষ করা যাবে না। সে-সব পত্র-পত্রিকায় গত কয়েক মাস ধরেই দ্বীপটা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ছাপা হচ্ছে। এই দ্বীপের নাম স্পেনসার আইল্যান্ড। অবস্থান সানফ্রান্সিসকো উপসাগরের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, ক্যালিফোর্নিয়া উপকূল থেকে কমবেশি চারশো ষাট মাইল দূরে–৩২°১৫ উত্তর অক্ষাংশ, ১৪৫°১৮ পশ্চিম দ্রাঘিমায়। দ্বীপটা নিঃসঙ্গ, আশপাশে অন্য কোন দ্বীপ বা ডাঙা নেই। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, স্পেনসার আইল্যান্ডের আশপাশ দিয়ে কোন জাহাজই আসা-যাওয়া করে না। অথচ খুব বেশি দূরে নয় ওটা, যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে কাছেই বলতে হবে। তাহলে কি কারণে জাহাজের ক্যাপটেনরা স্পেনসার আইল্যান্ডকে এড়িয়ে যান? কারণ হলো, ওদিকের সাগরে বিপজ্জনক ধরনের পরস্পরবিরোধী তীব্র স্রোত আছে, স্রোতগুলো প্রায় সারাক্ষণই ভীষণ ঘূর্ণি সৃষ্টি করে। ওই ঘূর্ণাবর্তে পড়লে কোন জাহাজকে আর বেরিয়ে আসতে হবে না, সোজা নেমে যেতে হবে সাগরের অতল গহ্বরে। তবে কথা হলো, কেউ যদি জাগতিক কোলাহল আর লোকজনের ভিড় অপছন্দ করে, তার জন্যে এই দ্বীপ আদর্শ জায়গা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বীপটা বিক্রি করতে চাইছে কেন? উত্তরে অনেক কথা বলতে হয়। সাধারণত যে জলপথ ধরে জাহাজগুলো চলাচল করে সেই পথ থেকে অনেকটা দূরে স্পেনসার আইল্যান্ড, ফলে দীর্ঘ বহু বছর ধরে পতিত পড়ে আছে ওটা, কোন কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তেমন সুযোগ-সুবিধেও নেই যে ওখানে উপনিবেশ গড়ে তোলা যাবে। সামরিক দিক থেকেও দ্বীপটা কোন গুরুত্ব বহন করে না। মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটা দূরে হওয়ায় নির্বাসনের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদেরও ওখানে পাঠাতে আগ্রহী নয় বিচারবিভাগ। এ-সব কারণেই আজ পর্যন্ত দ্বীপটাকে কোন কাজে লাগানো যায়নি। মার্কিন কংগ্রেসে ব্যবসায়িক মনোভাবাপন্ন সদস্যরাই সংখ্যায় বেশি, তাই এবার তাঁরা দ্বীপটাকে বিক্রি করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁদের দেয়া একটা শর্ত হলো ক্রেতাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। বিক্রি করা হবে ঠিকই, কিন্তু যে-কোন দামে নয়। সবচেয়ে কম দাম ধরা হয়েছে এগারো লাখ ডলার। যে-সব প্রতিষ্ঠান জমি কেনা-বেচা করে তাদের কাছে এগারো লাখ ডলার কোন টাকাই নয়। কিন্তু তারা বিনিয়োগ করে শুধু যেখানে লাভের সম্ভাবনা আছে। কোন্ দুঃখে তারা স্পেনসার আইল্যান্ড কিনতে যাবে? এখানে টাকা ঢালা মানেই তো লোকসান দেয়া। কেনা দ্বীপ ভাগ ভাগ করে তারা যদি জমি বেচতে চায়, কে তাদের সেই জমি কিনবে? কেউ না! কাজেই জানা কথা যে যাদের সামান্য হলেও কাণ্ডজ্ঞান বা বৈষয়িক বুদ্ধি আছে তারা কেউ এই নিলামে অংশ নিচ্ছে না। অথচ মার্কিন কংগ্রেস জেদ ধরে বসে আছে, এগারো লাখ ডলারের এক পয়সা কমেও স্পেন্সার আইল্যান্ড বিক্রি করা যাবে না। অর্থাৎ, জানা কথা, এই দ্বীপ বিক্রি হচ্ছে না। এমন গাধা কেউ নেই যে এত টাকা পানিতে ফেলতে রাজি হবে।

শর্ত অবশ্য আরও একটা আছে। দ্বীপটা যে-ই কিনুন, নিজেকে তিনি স্পেনসার আইল্যান্ডের রাজা বলে ঘোষণা করতে পারবেন না। তিনি যদি দ্বীপটাকে একটি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশাসক হতে চান, তাতে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি থাকবে না। রাজা হওয়া যাবে না, এই কথা শুনে অনেক কোটিপতিই হতাশ হয়ে পিছিয়ে গেছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই, মার্কেসাস প্রভৃতি দ্বীপে রাজা আছে, সে-কথা মনে রেখে অনেক ধনকুবেরই মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিলেন স্পেনসার আইল্যান্ড কিনে সেখানকার রাজা হয়ে বসবেন, কিন্তু এই শর্তের কথা শুনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন তাঁরা।

চেঁচাতে চেঁচাতে বেচারি জিনগ্রাসের গলাটাই বুঝি ভেঙে গেল। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দ্বীপটার কত প্রশংসাই না করছে সে, কিন্তু আগ্রহী ক্রেতা হিসেবে একজনও এগিয়ে আসছে না। মজা দেখতে আসা লোকজন এখনও হাসিঠাট্টা করছে। একজন বলল, 'আমার সম্বল দুই ডলার। দলিল তৈরির খরচ সহ দ্বীপটা যদি এই দুই ডলারে কেনা যায় তো আমি আছি।'

তার কথা শুনে আরেকজন বলল, 'তোমার ওই দুই ডলারই পানিতে যাবে। যে-ই কিনুক, তার ইহকাল ও পরকাল ঝরঝরে। দ্বীপটা যদি সরকার আমাকে বিনে পয়সায় দেয়, তা-ও আমি নেব না। তবে দ্বীপের সঙ্গে যদি মোটা অঙ্কের টাকা দেয়, তাহলে নেব কিনা চিন্তা করে দেখতে পারি।'

ঘরভর্তি লোক, সবাই কিছু না কিছু বলছে। আর তারই মধ্যে গলা ফাটাচ্ছে জিনগ্রাস, 'ফেলুন কড়ি মাখুন তেল, দ্বীপটা কিনে দেখান খেল্!'

নেই! কোন খদ্দের নেই।

মার্চেন্ট স্ট্রীটে মনোহারী দোকান আছে স্ট্রাম্পি-র, সে জিজ্ঞেস

করল, 'ওই দ্বীপে কি মালভূমি আছে?'

'কিংবা আগ্নেয়গিরি? কী, একটাও আগ্নেয়গিরি নেই?' কৃত্রিম হতাশায় মুষড়ে পড়ার ভান করল এক শুঁড়িখানার মালিক।

আরেক দফা হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

'গেল গেল গেল, এই বুঝি বিক্রি হয়ে গেল। আস্ত একটা দ্বীপ রে ভাই, আস্ত একটা দ্বীপ! নির্দিষ্ট দামের চেয়ে এক সেন্ট বেশি বলুন, দ্বীপটা সঙ্গে সঙ্গে আপনার হয়ে যাবে।'

অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। জিনগ্রাসের আহ্বানে কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

অবশেষে, এতক্ষণে, হার মানতে যাচ্ছে জিনগ্রাস। সে বলল, 'কেউ যদি কোন দাম না-ই বলেন, এই নিলাম বন্ধ ঘোষণা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের। তিন পর্যন্ত গোণার সঙ্গে সঙ্গে নিলাম বাতিল বলে গণ্য হবে। এক...দুই...'

'বারো লাখ ডলার!' অকস্মাৎ যেন ঘরের ভেতর বোমা পড়ল।

না, বোমা পড়লেও কেউ এরকম চমকে উঠত না। ঘরভর্তি লোকজন একেবারে যেন পাথর হয়ে গেল। সংবিৎ ফিরে পেতে সময় নিল সবাই। হতভম্ব হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে তারা। কে দাম হাঁকল? কার এত দুঃসাহস? লোকটা কি ছাগল, না পাগল?

না, তিনি পাগল বা ছাগল কোনটাই নন। তিনি একজন ধনকুবের। পরিচয়, সানফ্রান্সিসকোর উইলিয়াম ডব্লিউ কোল্ডেরুপ।

দুই

তিনি ডলার গোনেন কোটির অঙ্কে। এ থেকে আন্দাজ করা যায় উইলিয়াম ডব্লিউ কোল্ডেরুপ কেমন ব্যক্তি। বলা হয় তাঁর তুলনায় ওয়েস্টমিনস্টারের ডিউক, নেভাদার সিনেটর জোনস, রথসচাইল্ড, পানডেরবিল্ট, নর্দাম্বারল্যান্ডের ডিউক ন্যাকি নিতান্তই মধ্যবিত্ত সাধারণ লোক যেখানে এক-আধ শিলিং ব্যয় করতে মাথা চুলকায়, কোল্ডেরুপ সেখানে লাখ লাখ ডলার বিলিয়ে দেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় অনেকগুলো খনি আছে তাঁর, আছে সমুদ্রগামী জাহাজের বহর। তাছাড়া ইউরোপ আর আমেরিকার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তাঁর শত শত কোটি টাকা খাটছে কোল্ডেরুপের টাকা গাণিতিক হারে নয়, বাড়ে জ্যামিতিক হারে। বলা হয়, তাঁর যে কি পরিমাণ টাকা আছে তা নাকি তিনি নিজেই জানেন না। এটা আসলে মিথ্যে প্রচারণা। প্রতিটি ডলারের হিসাব রাখেন কোল্ডেরুপ। তবে ভদ্রলোক কখনও টাকার গরম দেখান না। দেমাক জিনিসটাও তাঁর স্বভাবে নেই।

দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শাখা এই মুহূর্তে বিশ হাজার। আমেরিকা, ইউরোপ আর অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর অফিসে কাজ করছে আশি হাজার কর্মচারী। দৈনিক চিঠি লেখা হয় কম করেও তিন লাখ লোককে। তাঁর পাঁচশো জাহাজ সাগর

পাড়ি দিচ্ছে। ডাকটিকিট আর রেভিনিউ স্ট্যাম্প কিনতেই তাঁর বেরিয়ে যায় বছরে দশ লাখ ডলার। কোন সন্দেহ নেই যে সানফ্রান্সিসকোর গৌরব ও মহিমা বলতে আজকাল কোল্ডেরুপকেই বোঝায়।

সানফ্রান্সিসকোর সেই গৌরব আর মহিমা যখন একটা ডাক দিলেন, সেটাকে কৌতুক মনে করে হেসে উড়িয়ে দেয়া যায় না। হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠল লোকজন। এখন আর কেউ ঠাট্টা বা ব্যঙ্গ করতে সাহস পাচ্ছে না। সবাই প্রায় একযোগে ফিসফাস শুরু করল, সবই প্রশংসাসূচক। তবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরই থেমে গেল সব শব্দ। লোকজন তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে। সবার মনে একটাই প্রশ্ন, এখন যদি কেউ পাল্টা দর হাঁকে? প্রতি জোড়া কান হয়ে উঠল খাড়া। এমন কি কেউ যদি কৌতুক করেও কোল্ডেরুপের দামের ওপর দাম বলে, তাহলে যে কি কাণ্ড ঘটবে কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছে সবাই। কিন্তু, নাহ্, তা কি কখনও হয়! এত সাহস কার যে কোল্ডেরুপের চেয়ে বেশি দাম দিয়ে দ্বীপটা কিনতে চাইবে?

কোল্ডেরুপ শুধু ধনকুবের নন, মানুষ হিসেবেও অত্যন্ত জেদী। কোন ব্যাপারে একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে কার সাধ্য তাঁকে টলায়। একবার যখন ডাক দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে দ্বীপটা তিনি কিনবেন, এই কেনা থেকে কেউ তাঁকে পিছু হটাতে পারবে না। দৈহিক দিক থেকে প্রকাণ্ড তিনি–পাঁজরের খাঁচাটা বিশাল, ধড়ের ওপর সাবধানে বসানো মস্ত মাথা। কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক চওড়া। শরীরের পেশী ইস্পাতের মত শক্ত। দৃষ্টিতে চঞ্চল ভাব নেই, একদম শান্ত, তবে সেখানে দৃঢ়তার কোন অভাব নেই, সে দৃষ্টি সহজে নত হতে জানে না। চুলের রঙ ধূসর, সামনের দিকটা ব্রাশ করা, তাসত্ত্বেও এমন ঝাঁকড়া দেখায় তিনি যেন অল্প বয়েসী

কোন তরুণ। সমকোণী ত্রিভুজের রেখার মত খাড়া ও সরল তাঁর নাক। গোঁফ না থাকলেও দাড়ি আছে, ইয়াঙ্কি ধাঁচে কাটা, জুলফি জোড়া বেশ চওড়া। আর দাঁতগুলোকে মুক্তো বললেই হয়। সব মিলিয়ে চেহারায় এমন একটা শক্তির ভাব আছে, দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে এই ব্যক্তিকে বড় কোন তুফানও টলাতে পারবে না। সবাই জানে, নিলামে কেউ যদি তার দামের ওপর দাম হাঁকে, উত্তরে তিনি শুধু একবার মাথা ঝাঁকাবেন, সেই সঙ্গে দরটা এক লাখ ডলার করে বেড়ে যাবে। তবে না, তাঁর দামের ওপর দাম বলার লোক এখানে কেউ নেই।

'গেল গেল গেল, পানির দরে বিকিয়ে গেল! বারো লাখ ডলার রে ভাই, মাত্র বারো লাখ ডলার!' জিনগ্রাস প্রবল উৎসাহে গলা ফাটাচ্ছে। 'আছেন কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী? নতুন একটা দর শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি আমরা! ভেবে দেখুন, মাত্র বারো লাখ ডলারে দ্বীপটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে! দাম একটু বাড়িয়ে যে-কেউ এটা কিনতে পারেন! যে-কেউ!'

শুঁড়িখানার মালিক ওকহার্স্ট ফিসফিস করছে, 'এর ওপর কেউ যদি একটা দাম বলে, তাকে যে দ্বীপটা কিনতেই হবে, তা নয়। কারণ একবার যখন কোল্ডেরুপ দাম হেঁকেছেন, এই দ্বীপ তিনি অন্য কাউকে কিনতে দেবেন না।'

উত্তরে মার্চেন্ট স্ট্রীটের মনোহারী দোকানের মালিক বলল, 'কোল্ডেরুপ খুব ভাল করেই জানেন যে তাঁর দামের ওপর দাম বলার সাহস কারও নেই।'

'শ্‌শ্‌শ্‌, চুপ!' পাশ থেকে এক লোক ধমকের সুরে থামিয়ে দিল ওদেরকে।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। জানে, নাটকীয় কিছু ঘটবে না; তবু অকশন হাউসের পরিবেশ উত্তেজনায় টান টান হয়ে

আছে। কি হয় না হয় ভাব। কোন্ডেরুপ কিন্তু একদম ঠাণ্ডা। চুপচাপ আছেন তিনি। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ভাবটা যেন, এ-ব্যাপারে তিনি কোন আকর্ষণ বোধ করছেন না। তবে যারা তাঁর খুব কাছাকাছি রয়েছে তারা স্পষ্টই দেখল, কোন্ডেরুপের চোখ হয়ে উঠেছে গুলিভরা রিভলভারের মত–কেউ নতুন একটা দাম হাঁকলেই ডলার ছুঁড়তে শুরু করে দেবে।

'আর কোন খদ্দের আছেন?' জিজ্ঞেস করল ফেলপর্গ।

ঘরের ভেতর পিনপতন নিস্তব্ধতা জমাট হয়ে আছে।

'গেল গেল গেল, এবার সত্যি সত্যি দ্বীপটা বিক্রি হয়ে গেল!' চিৎকার করে বলল জিনগ্রাস। 'বারো লাখ ডলার–এক। বারো লাখ ডলার–দুই!'

জিনগ্রাস থামতেই শুরু করল ফেলপর্গ, 'বারো লাখ ডলারে হীরের টুকরোর দ্বীপটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সবাই কি নিশ্চিত, আপনারা কেউ নতুন একটা দর বলবেন না? পুরোপুরি নিশ্চিত?'

দম আটকে, কান খাড়া করে আছে সবাই। একেবারে শেষ মুহূর্তে কেউ যদি নতুন একটা দর বলে! কিন্তু না, কেউ কিছু বলছে না। টেবিলের দিকে হাত লম্বা করে হাতুড়িটা তুলে নিল ফেলপর্গ টেবিলের ওপর পর পর তিনটে বাড়ি মারবে সে হাতুড়ি দিয়ে, সেই সঙ্গে নিলাম শেষ হয়ে যাবে। তখন আর কারুরই কিছু করার থাকবে না।

টেবিলের ওপর হাতুড়ির প্রথম বাড়িটা পড়ল। এখনও কেউ নতুন দর হাঁকছে না। দ্বিতীয় বাড়িও পড়ল। ঘরের ভেতর সবাই যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। এবার পড়তে যাচ্ছে তৃতীয় ও শেষ বাড়ি।

টেবিলের দিকে ধীরে ধীরে নেমে এল হাতুড়ি। টেবিল স্পর্শ করলেও, কোন শব্দ হলো না। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে ওপরে উঠল

সেটা, তারপরই দ্রুত নেমে আসছে নিচের দিকে।

টেবিলে হাতুড়ি পড়ল না, তার আগেই লোকজনের ভিড় থেকে তিনটে শব্দ উচ্চারিত হলো, 'তেরো লাখ ডলার!'

ঘরভর্তি লোক ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেলো, সেটা সম্ভবত টাকার অঙ্কটা শুনেই। তারপর উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই। যাক, শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী একজন পাওয়া গেছে! যুদ্ধ তাহলে একটা বাধলই। কিন্তু কে সেই বোকা? সানফ্রান্সিসকোর সম্রাটের ওপর দাম হাঁকে, উজবুকটার পরিচয় কি?

তার পরিচয়, জে. আর. টাসকিনার। স্টকটনের বাসিন্দা তিনি। টাসকিনার যতটা ধনী, সম্ভবত তারচেয়ে বেশি মোটা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, তবে কথাটা সত্যি, তাঁর ওজন চারশো নব্বুই পাউন্ড। দুনিয়ার সবচেয়ে মোটা লোক কে, তা নির্ধারণ করার জন্যে সেবার শিকাগোতে একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলো–টাসকিনার একটুর জন্যে প্রথম হতে পারেননি। কারণটা ছিল এই যে সেদিন তিনি সময়ের অভাবে নৈশভোজ শেষ না করেই উঠে পড়েন। সেজন্যেই যে লোকটা প্রথম হয়েছিল তার চেয়ে বারো পাউন্ড কম ওঠে টাসকিনারের ওজন।

মাংসপিণ্ডের বিশাল এই স্তূপ বা স্তম্ভটি যে-কোন চেয়ারে বা সোফায় বসতে পারেন না। বিশেষ মাপ দিয়ে আলাদাভাবে ওগুলো বানাতে হয় তাঁকে। স্টকটনে তাঁর প্রাসাদ আছে, সেখানকার সব আসবাব-পত্রই বিশেষ মাপে তৈরি। স্টকটন হলো ক্যালিফোর্নিয়ার খুব নামকরা একটা শহর, দক্ষিণাঞ্চলের খনি শিল্পের স্নায়ুকেন্দ্র। উত্তরেও খনি শিল্পের এরকম একটা স্নায়ুকেন্দ্র আছে– স্যাক্রামেনটো। স্টকটন আর স্যাক্রামেনটো পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

শুধু খনি আছে বলেই টাসকিনার এত ধনী নন। টাকার কুমির

হয়েছেন তিনি পেট্রল বেচে। জুয়া খেলা থেকেও মোটা টাকা আয় করেন। লোকে বলে, পোকার খেলায় গোটা যুক্তরাষ্ট্রে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকলে কি হবে, খুব কম লোকই তাঁকে পছন্দ করে। তারা বলাবলি করে, মানুষ হিসেবে টাসকিনারকে শ্রদ্ধা করা যায় না। স্নেহ জাতীয় পদার্থ যা আছে সবই তাঁর শরীরে, মনটা একেবারে শুকনো খটখটে, সেখানে এক ফোঁটা দয়া মায়া নেই। দয়ামায়া না থাকাতেই তিনি তাঁর প্রিয় রিভলভারটি কারণে-অকারণে প্রায়ই ব্যবহার করেন।

কোল্ডেরুপকে দু'চোখে দেখতে পারেন না টাসকিনার। কোল্ডেরুপের অনেক টাকা, এটাই তাঁর ঈর্ষা ও রাগের মূল কারণ। কোল্ডেরুপকে সবাই সম্মান করে, তাঁর খ্যাতি আছে, এ-সব দেখে হিংসায় জ্বলেন তিনি। কোল্ডেরুপ তাঁর কাছে ঘৃণার পাত্র। যে-কোন সুযোগ পেলেই হয়, কোল্ডেরুপকে উত্ত্যক্ত করতে ছাড়েন না। ঝগড়া করার জন্যে সবসময় এক পায়ে খাড়া হয়ে আছেন। কোল্ডেরুপ অবশ্য এ ধরনের ঈর্ষাকাতর লোক অনেক দেখেছেন, কাজেই তাঁকে মোটেও গুরুত্ব দেন না। তাঁর সঙ্গে যতবার লাগতে এসেছেন টাসকিনার, প্রতিবার জব্দ করেছেন।

বেশিদিন আগের কথা নয়, স্যাক্রামেনটোর আইনসভার নির্বাচনকে উপলক্ষ করে দু'জনের মধ্যে বিরোধটা চরম আকার ধারণ করেছিল। নির্বাচনী প্রচারণার সময় কোল্ডেরুপের নামে গাদা গাদা মিথ্যে অভিযোগ আনেন টাসকিনার। তাঁর মুখে কিছুই আটকায়নি, অশ্রাব্য গালিগালাজের তুফান ছুটিয়েছেন। নির্বাচনে জেতার জন্যে বস্তা বস্তা টাকাও খরচ করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি, শেষ পর্যন্ত ভোটে জিতে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কোল্ডেরুপই। সেই থেকে আরও বেশি খেপে আছেন

টাসকিনার। এই ঘা শুকাতে আরও অনেক সময় লাগবে তাঁর। কে জানে, কোনদিনই হয়তো শুকাবে না।

কেউ জানে না খবরটা কিভাবে পেলেন টাসকিনার। চারদিকে অবশ্য অনেক চর আছে তাঁর। যেভাবেই পান খবর, যে-ই শুনলেন কোল্ডেরুপ স্পেনসার আইল্যান্ড কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অমনি ছুটে এসেছেন তাঁকে উত্ত্যক্ত করার জন্যে। দ্বীপটা যে কোন কাজে লাগবে না, এ-কথা কোল্ডেরুপ যেমন জানেন, তেমনি টাসকিনারও জানেন। তবু দর বাড়িয়ে দিয়ে কোল্ডেরুপকে খেপিয়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য।

আগেই অকশন হাউসে পৌঁছেছেন টাসকিনার, তবে কুমতলবটি কাউকে টের পেতে দেননি। চুপচাপ ছিলেন, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর যখন মনে হলো কোল্ডেরুপ নিশ্চিত হয়ে গেছে দ্বীপটা কিনতে তাকে কেউ বাধা দেবে না, ঠিক তখনই বোমা ফাটালেন, 'তেরো লাখ ডলার!'

ঘরভর্তি লোক ঘাড় ফেরাল। 'ও, মোটকু টাসকিনার!' সবাই ফিসফাস শুরু করল।

মোটকু টাসকিনারকে দেশের কে না চেনে। ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকিয়েদের কল্যাণে তাঁর বেঢপ শরীরের প্রতিরূপ নামকরা প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হয়।

উত্তেজনার প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে যেতেই অকশন হাউসে নিস্তব্ধতা নেমে এল। এখন সম্ভবত মাকড়সা জাল বুনলেও শোনা যাবে। এ যুদ্ধ শুধু যে কোল্ডেরুপ বনাম টাসকিনার, তা নয়–এ আসলে ডলার বনাম ডলার যুদ্ধ। দু'জনেরই তো টাকার পাহাড় আছে।

নিস্তব্ধতা খান খান হলো ফেলপর্গের আহাজারিতে, 'গেল গেল গেল, স্পেনসার আইল্যান্ড মাত্র তেরো লাখ ডলারে বিক্রি হয়ে

গেল...'

কোল্ডেরুপ ধীরেসুস্থে দাঁড়ালেন। সরাসরি চারশো নব্বুই পাউন্ড অর্থাৎ টাসকিনারের দিকে তাকিয়ে আছেন। এরইমধ্যে লোকজন সরে গিয়ে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে জায়গা করে দিয়েছে। সানফ্রান্সিসকোর গৌরব আর স্টকটনের উচ্চাশা পরস্পরের দিকে নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছেন। চোখের পলক না ফেলে কোল্ডেরুপ বললেন, 'চোদ্দ লাখ ডলার।'

টাসকিনারও চোখ নামাতে রাজি নন। হাঁকলেন, 'পনেরো লাখ।'

'ষোলো লাখ।'

'সতেরো লাখ।'

সেই গল্পটা জানেন, গ্লাসগোর দুই মাতব্বরের? দু'জনেই কারখানার মালিক, পরস্পরকে চ্যালেঞ্জ করে বসল, আমার চিমনি তোমার চিমনির চেয়ে উঁচু হবে। এই হলো প্রতিযোগিতার বিষয়। এখানেও যেন তাই ঘটছে, শূন্যে চিমনি খাড়া করছেন কোল্ডেরুপ আর টাসকিনার, দেখতে চান কে কার চেয়ে উঁচুতে তুলতে পারেন–এ চিমনি অবশ্য নিখাদ সোনায় মোড়া।

নতুন দর হাঁকার আগে প্রতিবারই কোল্ডেরুপ একটু সময় নিচ্ছেন। কিন্তু টাসকিনার দ্বিধাহীন ভঙ্গিতে একের পর এক বোমা ফাটিয়ে চলেছেন।

'সতেরো লাখ ডলার!' চিৎকার করছে ফেলপর্গ। 'পানির দর, ভাই, পানির দর! স্পেনসার আইল্যান্ড বাচ্চা ছেলের খেলনা নাকি যে মাত্র সতেরো লাখ ডলারে বিক্রি হয়ে যাবে! আরে সাহেব, সত্যি যদি কিনতে চান, দাম আরেকটু বাড়াতে হবে। হয় আপনি বাড়ান, না হয় আপনি! একজন দর বাড়ালে, অপরজন দমে যাবেন না, প্লীজ। আমরা দেখতে চাই না বিনা যুদ্ধে আপনারা

কেউ রণে ভঙ্গ দিয়েছেন!'

'আঠারো লাখ ডলার!' সাবধানে, ধীরে ধীরে বললেন কোল্ডেরুপ।

'উনিশ!' হুঙ্কার ছাড়লেন টাসকিনার।

'বিশ লাখ!' এবার যেন কোল্ডেরুপ কিছু না ভেবেই দামটা বলে ফেললেন। ইতিমধ্যে তাঁর মুখের রঙ কেমন ম্লান হয়ে উঠেছে। তবে এখনও তিনি জেদ ধরে আছেন। এর শেষ না দেখে ছাড়বেন বলে মনে হয় না।

রাগে দিশেহারা বোধ করছেন টাসকিনার। চোখ জোড়া টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তাঁর। মোটা আঙুলগুলো বুক পকেটের ক্রনোমিটারটা নাড়াচাড়া করছে। 'চব্বিশ লাখ ডলার!' এক লাফে দরটা অনেক বাড়িয়ে দিয়ে ভাবছেন, প্রতিদ্বন্দ্বী আর তাঁর নাগাল পেতে চেষ্টা করবে না।

শান্ত গলায় কোল্ডেরুপ বললেন, 'সাতাশ লাখ।'

'উনত্রিশ।'

'ত্রিশ।'

কোল্ডেরুপ ত্রিশ লাখ ডলার হাঁকতেই তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল অকশন হাউস। টাসকিনার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। কোন কথাই তিনি বলছেন না। নিলামদার টেবিলের ওপর হাতুড়ি পেটাল–একবার, দু'বার। আর একবার হাতুড়ির বাড়ি পড়লেই স্পেনসার আইল্যান্ড তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি কোল্ডেরুপের কাছে হেরে যাবেন। কোল্ডেরুপের ত্রিশ লাখ হাঁক শুনে প্রায় কাত হয়ে পড়ে যাবার অবস্থা হয়েছে তাঁর। সেই অবস্থা থেকেই কোন রকমে চিঁচিঁ করে উচ্চারণ করলেন, 'পঁয়ত্রিশ লাখ।'

'চল্লিশ লাখ ডলার,' সঙ্গে সঙ্গে বললেন কোল্ডেরুপ।

টাসকিনারের মাথায় যেন কুড়ুলের কোপ লাগল। মাথাটা আপনা থেকেই হেঁট হয়ে এল তাঁর। পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেন তিনি। টেবিলে হাতুড়ি পড়তে শুরু করেছে। একবার, দু'বার, তিনবার।

মাথা তুলে তাকালেন টাসকিনার, দু'চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। 'এর প্রতিশোধ কিভাবে নিতে হয় আমার তা জানা আছে,' হিসহিস করে বললেন তিনি। ঘুরে চলে গেলেন অকসিডেন্টাল হোটেলের দিকে। রাগে ও ঘৃণায় তাঁর সর্বশরীর হুহু করে জ্বালা করছে।

ওদিকে অকশন হাউসে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। উল্লাসে নাচানাচি করছে লোকজন। এ আনন্দ-উল্লাসের কারণ এই নয় যে কোল্ডেরুপ দ্বীপটা কিনতে পেরেছেন, আসল কারণ হলো টাসকিনারকে অপমান করা গেছে। ভিড় ঠেলে মন্টোগোমারি স্ট্রীটে ফিরে গেলেন কোল্ডেরুপ।

তিন

মন্টোগোমারি স্ট্রীটে তাঁর যে অট্টালিকা, সেটা বিশালত্ব আর সৌন্দর্যের দিক থেকে যে-কোন রাজপ্রাসাদকেও হার মানাবে। বৈঠকখানায় ঢুকলেন কোল্ডেরুপ। ঘরে তখন পিয়ানো বাজছে। ঢুকেই মনে মনে বললেন, 'ওরা দু'জনেই দেখছি আছে। ভালই

হলো। যাই, খাজাঞ্চীকে ব্যাপারটা জানাই, তারপর ওদের সঙ্গে আলাপ করা যাবে।'

অফিসে এসে স্পেনসার আইল্যান্ড কেনা সংক্রান্ত তুচ্ছ খবরটা কর্মচারীদের জানালেন তিনি। হাতব্যাগে কিছু দলিল আছে, সেগুলোয় স্ট্যাম্প সেঁটে সীল-মোহর লাগিয়ে দিলেই দ্বীপটা তাঁর হয়ে যাবে। বাকি থাকবে শুধু দু'চার লাইন লিখে ব্যাপারটা তাঁর দালালকে জানানো। অফিস থেকে যখন বেরুলেন, গোটা ব্যাপারটা মন থেকে তার আগেই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন।

বৈঠকখানায় তখনও বসে আছে ওরা দু'জন। মেয়েটি পিয়ানো বাজাচ্ছে। ছেলেটি সোফায় আধ-শোয়া অবস্থায়, চেহারায় কেমন একটা উদাস ভাব।

'শুনছ ঠিকই, কিন্তু সুরটা কি ধরতে পারছ?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

'তাহলে বলেই ফেলি, ফিনা! "বুড়ো রবিন গ্রে"-র সুর এত ভাল আগে কখনও বাজাওনি তুমি।'

'না, গডফ্রে, হলো না! আমি "সুখী মুহূর্ত" বাজাচ্ছি!'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো! দুঃখিত, এবার মনে পড়েছে।' গডফ্রে সত্যি সত্যি অন্যমনস্ক হয়ে আছে।

কাতর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ফিনা। গডফ্রে সাহস করে ওর দিকে তাকাচ্ছে না।

মেয়েটির নাম ফিনা হলানে। সে কোল্ডেরুপের পালিতা কন্যা। একেবারে সেই শিশুকাল থেকে কোল্ডেরুপই ওকে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। মাত্র ষোলো বছর বয়েস ফিনার। রূপ-সৌন্দর্য অসাধারণ কিছু না হলেও, অবশ্যই রূপসী বলতে হবে। মেয়েটির বয়েস কম হলে কি হবে, সাংসারিক বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। সেজন্যে মাঝে মধ্যে লোকে তাকে ভুল বোঝে,

স্বার্থপর মনে করে। এই বয়েসের মেয়েরা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে, কিন্তু ফিনা ব্যতিক্রম। রাতে ঘুমের মধ্যে যদিও বা দু'একটা দেখে, দিবাস্বপ্ন কখনোই দেখে না। এই মুহূর্তে ফিনা ঘুমাচ্ছে না, এমন কি ঘুমাবার কোন ইচ্ছাও ওর নেই। 'গডফ্রে?' ডাকল ও।

'বলো।'

'জানো, তুমি এখন কোথায়?'

'তোমার কাছে, এই ঘরে...'

'না, গডফ্রে। তুমি এই ঘরে বা আমার কাছে, কোথাও নেই। তুমি অনেক দূরে চলে গেছ। কি, ঠিক বলিনি?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পিয়ানোয় বিষণ্ন একটা সুর তুলল মেয়েটা। ওর এই সুর কোল্ডেরুপের ভাগ্নে গডফ্রের কাছে কেমন যেন অচেনা আর দুর্বোধ্য লাগল।

গডফ্রের মা কোল্ডেরুপের বোন। ফিনার মত গডফ্রের মা-বাবাও সেই ছোটবেলাতেই মারা গেছেন। কোল্ডেরুপের খুব ইচ্ছে ভাগ্নের সঙ্গে ফিনার বিয়ে দেবেন।

গডফ্রে তেইশে পা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার পর অলস সময় কাটাচ্ছে সে। লেখাপড়া শিখে এক অর্থে কোনই লাভ হয়নি, কারণ খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্যে তাকে কোন কাজ করতে হবে না। ছেলে হিসেবে শান্ত ও ভদ্র সে। প্রখর উপস্থিত বুদ্ধি। আচরণে যেমন দেমাক বা অহঙ্কার নেই, পোশাকে-আশাকেও তেমনি জাঁকজমক পছন্দ করে না। বিয়েটা হলে দু'জনেই কোল্ডেরুপের কাছ থেকে বিপুল সম্পদ যৌতুক হিসেবে পাবে। পরস্পরকে ওরা ভালবাসে কিনা, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, কারণ কোল্ডেরুপের কথার ওপর কথা বলবে এত সাহস কার? তিনি চান খুব শিগ্‌গির বিয়েটা দেবেন। আর এখানেই একটু ঝামেলা দেখা দিয়েছে।

গডফ্রে ভাবছে, বিয়ে করার বয়স এখনও তার হয়নি। বিবাহ একটি গুরুদায়িত্ব, তা কাঁধে নেয়ার মত যোগ্যতা এখনও সে অর্জন করেনি। তবে বিয়ের ব্যাপারে এখনও কেউ তার মতামত জানতে চায়নি। তা চাইলে অনেক কথাই বলার আছে তার। লেখাপড়া শেষ করার পর থেকে জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগছে গডফ্রের। কিছু না চাইতেই সব পেয়ে যাওয়া যার ভাগ্য, জীবনটা তার কাছে বিরক্তিকর তো লাগবেই। সেই ছোটবেলা থেকে প্রবল আগ্রহ ছিল, বিশ্বভ্রমণে বেরুবে সে। অথচ সানফ্রান্সিসকো ছাড়া এখনও তার কিছু চেনা হলো না। দুনিয়াটা দু'চারবার ঘুরে দেখতে অসুবিধে কি? কিন্তু সানফ্রান্সিসকো ছেড়ে দূরে কোথাও যাবার অনুমতি নেই তার। কাজেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা করছে সে, যেখানে যা পাওয়া যায় ভ্রমণকাহিনী পড়ছে। মার্কো পোলোর পিছু নিয়েছে, দেখে এসেছে কুবলাই খানের দরবার। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সঙ্গে থেকে আবিষ্কার করেছে আমেরিকা। ক্যাপটেন কুকের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরেও গেছে। আর গেছে অবাচিতে, দ্যুমোঁ দুরবিয়র-এর সঙ্গে। গডফ্রের খুব ইচ্ছা, তাকে সঙ্গে না নিয়ে ভ্রমণকারীরা যে-সব দেশে গেছেন সেসব দেশে অন্তত একবার করে বেড়িয়ে আসবে সে। বিশ্বভ্রমণে বেরুলে ঝুঁকি নিতে হয়, জানে গডফ্রে, তা নিতে তার আপত্তিও নেই। নৌ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে সে, জলদস্যুদের সঙ্গে লড়বে, জাহাজডুবির ঘটনা ঘটলে সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। নির্জন কোন দ্বীপে কয়েক বছর একা কাটিয়ে দিতে হলেও রাজি সে, আলেকজান্ডার সেলকার্ক বা রবিনসন ক্রুসোর মত। হ্যাঁ, যে যাই বলুক, রবিনসন ক্রুসোই সে হতে চায়। ড্যানিয়েল ডিফো আর জোহান ওয়েস পড়ার পর এই ইচ্ছাটাই তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। অথচ ঠিক এই সময় মামা কিনা তার বিয়ে দেয়ার জন্যে

উঠেপড়ে লেগেছেন!

ফিনা ওরফে ভাবী মিসেস গডফ্রে মরগানকে নিয়ে কি আর রবিনসন ক্রুসো হওয়া সম্ভব? যেতেই যদি হয়, একাই যেতে হবে তাকে, ফিনাকে সঙ্গে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। স্ত্রীকে রেখে যাবার অনুমতি যদি না পায়, এখন তাহলে তার বিয়ে করা চলে না। কে না জানে যে বিয়ে মানেই শিকল। দুনিয়াটা একবার ঘুরে দেখে আসুক, তারপর বিয়ে হলে ক্ষতি কি?

এটাই গডফ্রের অন্যমনস্কতার কারণ। ফিনার কথা শুনে সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করল সে। আর ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলেন কোল্ডেরুপ। ঢুকেই বললেন, 'তাহলে এবার একটা তারিখ ঠিক করতে হয়। শুভ কাজে আমি দেরি করতে চাই না।'

'তারিখ? কিসের তারিখ, মামা?' রীতিমত আঁতকে উঠল গডফ্রে।

'কিসের তারিখ মানে? তোদের বিয়ের তারিখ!' হেসে উঠে একটু রসিকতা করলেন কোল্ডেরুপ, 'নাকি ভেবেছিস আমার বিয়ের তারিখ ঠিক করতে বলছি?'

'বাবা, বিয়ের তারিখ পরে ঠিক কোরো।' পিয়ানো ছেড়ে উঠে পড়ল ফিনা। 'তার আগে ঠিক করো, কবে যাওয়া হবে।'

'মানে?'

'কেন, বাবা, তুমি জানো না? বিয়ের আগে গডফ্রে বিশ্বভ্রমণে বেরুতে চায়।'

'কি?' ঝট করে ভাগ্নের দিকে ফিরলেন কোল্ডেরুপ। তারপর হাত বাড়িয়ে এমন ভঙ্গিতে তার দিকে এগোলেন, যেন গডফ্রে পালাবার চেষ্টা করলেই খপ্ করে ধরে ফেলবেন। 'তুই বেড়াতে যাবি?'

'হ্যাঁ, মামা।'

'কতদিন বেড়াবি?'

'দেড় কি দু'বছর, সব নির্ভর করবে...'

'সব কিসের ওপর নির্ভর করবে?'

'তুমি যদি আমাকে যাবার অনুমতি দাও, আর ফিনা আমার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি হয়।'

'ফিনা তোর জন্যে অপেক্ষা করবে? বিয়ের কথা শুনেই যে ছেলে পালিয়ে যেতে চায়, তার জন্যে অপেক্ষা?'

'বাবা, গডফ্রেকে তোমার যেতে দেয়াই উচিত,' শান্ত গলায় বলল ফিনা। 'আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি। আমার চেয়ে ওর বয়েস বেশি হলে কি হবে, দুনিয়াদারি সম্পর্কে ওর কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাই ছেলেমানুষিও যায়নি। বেড়ালে পরিণত হবে ও। দুনিয়াটাকে দেখে আসতে চাইছে, আসুক না দেখে। সব দেখার পর যদি ফিরে আসতে মন চায়, আসবে–আমি তো থাকবই।'

'এ-সব কি বলছিস তুই!' কোল্ডেরুপ হতভম্ব। 'খাঁচা খুলে পাখিটাকে ছেড়ে দিতে চাইছিস?'

'হ্যাঁ, মাত্র দু'বছরের জন্যে।'

'এই দু'বছর ওর জন্যে তুই অপেক্ষা করবি?'

'দু'বছর যদি ধৈর্য ধরতে না পারি, তাহলে আর ওকে ভালবাসলাম কি!' বলে আবার পিয়ানোয় গিয়ে বসল ফিনা।

কাঠ হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গডফ্রে, তার মাথাটা ধরে আলোর দিকে ফেরালেন কোল্ডেরুপ, ভাগ্নের চেহারাটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন। 'সত্যি তুই যেতে চাইছিস, গডফ্রে? সত্যি?'

গডফ্রে নয়, পিয়ানো থেকে জবাব দিল ফিনা। 'হ্যাঁ, বাবা, সত্যি যেতে চাইছে ও।'

'এই তাহলে তোর মনের কথা? ফিনাকে বিয়ে করার আগে দুনিয়াটাকে একবার ঘুরে দেখবি? ঠিক আছে, যা। কিন্তু কোথায় যাবি ঠিক করেছিস?'

'ঠিক করার দরকার নেই, মামা। যেদিক দু'চোখ যায় সেদিক যাব। যেদিকে মন চায় সেদিক যাব।'

'কবে যেতে চাস?'

'তুমি যদি আজ অনুমতি দাও তো আজই।'

'বেশ,' বললেন কোল্ডেরুপ। ভাগ্নের দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি। হিস হিস করে আবার বললেন, 'তবে আজ নয়, কিছুদিন পর –যাবার আগে প্রস্তুতি দরকার।' এগিয়ে এসে হঠাৎ পিয়ানোর চাবিতে এমনভাবে চাপ দিলেন, কর্কশ ও বেসুরো আর্তনাদ করে উঠল সেটা।

চার

ভদ্রলোকের নাম টি. আর্টলেট, কিন্তু লোকে তাঁকে টার্টলেট বলেই ডাকে। টার্টলেট নৃত্যকলায় পণ্ডিত, রীতিমত একজন অধ্যাপক। বয়স পঁয়তাল্লিশ। এখনও বিয়ে করেননি, তবে এক বয়স্কা মহিলার সঙ্গে প্রায় বারো বছর ধরে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

সতেরো জুলাই, আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম, রাত ঠিক সোয়া তিনটেয়। এতদিন দৈর্ঘ্যে তিনি পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি আর

প্রস্থে সোয়া দু'ফুট হয়েছেন। গত বছরে ছয় পাউন্ড বাড়ায় এখন তাঁর ওজন হয়েছে একশো পাউন্ড দুই আউন্স। মাথাটা চারকোনা। চুলের রঙ ধূসর বাদামী, কপালের কাছে নেই বললেই চলে। কপালটা বেশ চওড়া। ডিম্বাকৃতি মুখ। গায়ের রঙ ফর্সা। চোখের রঙ ধূসর বাদামী। চোখ জোড়া গর্তে ঢোকা, তবে দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। নাকের তলায় গোঁফটাকে রাজকীয় না বলে উপায় নেই, চিবুকে সুন্দর দাড়ি আছে। জীবনযাত্রা নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। আচরণে শান্তশিষ্ট। নৃত্য করেন ও নৃত্য শেখান, তাই মোটাসোটা হবার সুযোগ পাননি। ফুসফুস অত্যন্ত স্পর্শকাতর, একটুতেই বুকে ঠাণ্ডা লেগে যায়, তাই ধূমপান পরিহার করে চলেন। কফি ও মদ স্পর্শ করেন না। হালকা বিয়ার চলে, আর মাঝে মধ্যে চলে মেয়েলি পানীয় শ্যাম্পেন। শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে এতটা সতর্ক বলেই জন্মের পর থেকে তাঁর জন্যে কখনও ডাক্তার ডাকতে হয়নি। হাত-পা খুব দ্রুত নড়ে, ক্ষিপ্রবেগে হাঁটেন। সোজা-সরল মানুষ, কোন ঘোরপ্যাঁচ পছন্দ করেন না। নিজের নয়, সারাটা জীবন শুধু অন্যের উপকার করার কথা ভাবছেন। স্ত্রী অসুখী হতে পারেন, শুধু এই ভয়ে এখনও বিয়ে করতে পারছেন না।

কোল্ডেরুপ প্রাসাদে নৃত্যশিক্ষক হিসেবেই তাঁর আগমন ঘটেছিল। তার আগে যেখানে তিনি অধ্যাপনা করতেন, ছাত্র সংখ্যা কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। এখানে তিনি বেশ ভালই আছেন। কিছু কিছু বাতিক থাকলেও, মানুষ হিসেবে তিনি খুবই ভাল, সেই সঙ্গে সাহসীও বটেন। গডফ্রে আর ফিনাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন, তারাও তাঁকে ভারি পছন্দ করে। টার্টলেটের একটাই উচ্চাশা—নাচের সমস্ত রহস্য' এই দু'জনকে শেখাতে হবে।

তো অধ্যাপক টার্টলেটকেই ভাগ্নের সহযাত্রী হিসেবে বেছে

নিলেন কোল্ডেরুপ। তিনি আভাস পেয়েছেন, গডফ্রের এই যে বেড়াতে যাবার শখ চেপেছে, তাতে প্রথম থেকেই ইন্ধন যুগিয়েছেন টার্টলেট। কাজেই সিদ্ধান্ত নিলেন, গডফ্রে যখন যাবেই, তার সঙ্গে টার্টলেটও যান। পরদিন, মে মাসের ষোলো তারিখে, নিজের অফিসে ডেকে পাঠালেন তাঁকে।

কোল্ডেরুপের ডাকটা অনুরোধই, কিন্তু টার্টলেট সেটাকে অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করলেন। যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হলেন তিনি, তারপর পকেট-বেহালাটা নিয়ে নাচতে নাচতে প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় উঠে এলেন। নক করলেন একবার, দরজা ঠেলে অফিস কামরায় ঢুকলেন—শরীরটা একদিকে কাত হয়ে আছে, কনুইসহ হাত প্রায় বৃত্ত রচনা করেছে, হাসি হাসি মুখ, গোড়ালি জোড়া শূন্যে তোলা, ফলে শরীরের সব ভার চেপেছে পায়ের পাতায়। অন্য কোন লোক এই ভঙ্গিতে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেত, কিন্তু টার্টলেট সটান দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন।

'মি. টার্টলেট,' কোল্ডেরুপ বললেন, 'আপনাকে একটা খবর দেয়ার জন্যে ডেকেছি। খবরটা শুনে আপনি হয়তো চমকে উঠবেন।'

'বলুন।'

'এক দেড় বছরের জন্যে আমার ভাগ্নের বিয়েটা পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। গডফ্রের ইচ্ছে হয়েছে দেশ ভ্রমণে বেরুবে।'

'গডফ্রে তো সোনার টুকরো ছেলে। আমি জানি, সে তার দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে...'

ভূমিকার শুরুতেই টার্টলেটকে থামিয়ে দিলেন কোল্ডেরুপ। 'সোনার টুকরো ছেলেটা শুধু কি তার দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে? আমার তো ধারণা সে তার নাচের মাস্টারেরও মুখ উজ্জ্বল করবে।'

কোল্ডেরুপের ঠাট্টা টার্টলেট ধরতে পারলেন না। স্থির একটা নৃত্যভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেটা বদলে আরেকটা ভঙ্গি নিলেন। তাঁর হাসি দেখে বোঝা গেল, কথাটাকে তিনি তাঁর প্রশংসা বলেই ধরে নিয়েছেন।

কোল্ডেরুপই আবার মুখ খুললেন, 'ছাত্রের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, আপনার মন খারাপ করবে না?'

'মন খারাপ? হ্যাঁ, অবশ্যই মন খারাপ করবে। তবে প্রয়োজন হলে...'

কোল্ডেরুপ আবার তাকে বাধা দিলেন, 'আমার মতে, শিক্ষকের কাছ থেকে প্রিয় ছাত্রকে আলাদা করা এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, গডফ্রের সঙ্গে তার শিক্ষকও বিশ্বভ্রমণে যাবেন। একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রের মনে বেড়ানোর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছেন, কাজেই তাঁকে সম্মানিত করা উচিত।'

টার্টলেট আবার নৃত্যভঙ্গিমায় একটা পরিবর্তন আনছিলেন, কোল্ডেরুপের কথায় মনোযোগ থাকায় তাতে খানিকটা ত্রুটি থেকে গেল। তবে সেটা সংশোধনের কথা তাঁর মনে থাকল না।

সানফ্রান্সিসকো তথা ক্যালিফোর্নিয়ার বাইরে পা ফেলতে হবে, এ-কথা জীবনে কখনও ভাবেননি টার্টলেট। বিশ্বভ্রমণে বেরুতে হবে তাঁকে? সাগর পাড়ি দিতে হবে? স্বভাবতই বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেছেন ভদ্রলোক। হ্যাঁ, কথাটা সত্যি, প্রিয় ছাত্রকে তিনি অ্যাডভেঞ্চারে যাবার জন্যে প্ররোচিত করেছেন। ব্যাপারটা বুমেরাং হয়েছে। এখন ঝুঁকি আর ঝামেলা সব তাঁর ওপর দিয়েই যাবে। তিনি তোতলাতে শুরু করলেন, "আ-আ-মি, মা-নে, আ-আ...'

'হ্যাঁ, গডফ্রের সঙ্গে আপনিই যাবেন,' কোল্ডেরুপের গলায় রায় ঘোষণার সুর, বুঝিয়ে দিলেন এ বিষয়ে তিনি আর কোন কথা

বলতে আগ্রহী নন।

প্রতিবাদ করার সাহস নেই, 'শাস্তি'-টা মাথা পেতে নিতে হলো টার্টলেটকে। 'কবে যাব আমরা?' নাচের মুদ্রা আরেকবার পাল্টে জিজ্ঞেস করলেন।

'খুব তাড়াতাড়ি, মাসখানেকের মধ্যেই।'

'প্রথমে কোথায় যাব?'

'প্রশান্ত মহাসাগর ধরে প্রথমে যাবেন নিউজিল্যান্ডে,' বললেন কোল্ডেরুপ। 'শুনেছি ওখানে নাকি মাওরিদের কনুই অত্যন্ত শক্ত, বেরিয়ে থাকে বাইরের দিকে, তাতে নাকি অন্য লোকের পাঁজরে খোঁচা মারা খুব সহজ। ওদেরকে আপনারা কনুই ভাঁজ করে রাখার নিয়ম শেখাবেন।' মাথা ঝাঁকিয়ে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন তিনি।

নাচ ভুলে গেলেন টার্টলেট, অন্তত আপাতত। গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে এমন এক ভঙ্গিতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, সেটাকে কোনভাবেই নৃত্য বলা চলে না, হাঁটাই বলতে হবে।

কোল্ডেরুপের ব্যক্তিগত নৌ-বহর আছে। তারই একটা জাহাজ নিয়ে সাগর পাড়ি দেবে গডফ্রে। জাহাজটার নাম '[illegible]'। ছয়শো টন ওজন, দুশো ঘোড়া শক্তি। শক্ত-সমর্থ, সাতঘাটের পানি খাওয়া ক্যাপটেন টারকট আপাদমস্তক নাবিক। হারিকেন, টর্নেডো, সাইক্লোন আর টাইফুন তাঁর বন্ধু। বয়স পঞ্চাশ হলে কি হবে, চল্লিশ বছরই কেটেছে সাগরে। তিনি যাননি, এমন সাগর দুনিয়ায় একটিও নেই। ক্যাপটেন টারকট বাদে আরও আঠারোজন থাকছে জাহাজে—একজন মেট, একজন এঞ্জিনিয়ার, বয়লার রুমের কর্মী চারজন, বারোজন দক্ষ মাল্লা। ঘণ্টায় আট মাইলের বেশি স্পীড তোলার প্রয়োজন না হলে সাগর পাড়ি দেয়ার জন্যে এই জাহাজের কোন তুলনা নেই।

স্বপ্ন কোন মাল বহন করবে না। মাল-পত্র না থাকায়, জাহাজটাকে যদি কোন কারণে ডুবিয়ে দিতে হয়, কোল্ডেরুপের তেমন কোন লোকসান হবে না। ওদেরকে নিয়ে বেড়ানোর ফাঁকে স্বপ্নকে একটা দায়িত্বও পালন করতে হবে–বিভিন্ন দেশে নানারকম ব্যবসা আছে কোল্ডেরুপের, সুযোগ-সুবিধে মত সে-সব ব্যবসা তদারকি করতে হবে। ক্যাপটেন টারকটের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসলেন কোল্ডেরুপ বেশ কয়েকবার। সে-সব বৈঠকে কি নিয়ে আলোচনা হলো তা কেউ জানতে পারল না। সবাই শুধু জানল যে স্বপ্ন প্রথমে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে নোঙর ফেলবে। তবে কয়লার প্রয়োজন দেখা দিলে প্রশান্ত মহাসাগরের যে-কোন দ্বীপে বা কোন চীনা বন্দরে থামতে পারবে।

রওনা হবার আগে গডফ্রে আর ফিনার যুগল ফটো তোলা হলো। হাজার হোক বাগদত্ত তো! যুগল ছবি ছাড়াও দু'জনের আলাদা আলাদা ছবিও তোলা হলো। ফিনার ছবি থাকবে স্বপ্নে, মানে জাহাজে। আর গডফ্রের ছবি ঝুলবে ফিনার শোবার ঘরে।

টার্টলেটেরও একটা ফটো তোলার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে ছবিটা তোলার পর দেখা গেল এমন ঝাপসা হয়ে আছে যে মানুষটিকে চেনাই যাচ্ছে না। আসলে ক্যামেরাম্যান বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্যেও স্থির হতে পারেননি টার্টলেট, ফলে ছবিটা নড়ে গেছে। অবশ্য আরও কয়েকবার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু ফলাফল সেই একই। টার্টলেট স্থির হতে পারেন না, কাজেই তার ছবিও ঝাপসা ওঠে। শেষ পর্যন্ত গোটা পরিকল্পনাটাই বাদ দিতে হলো।

নয় জুন। সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে রওনা হবার জন্যে জাহাজের এঞ্জিন স্টার্ট দেয়া হলো। কাগজ-পত্র সব ঠিক আছে কিনা শেষবার দেখা হচ্ছে। হ্যাঁ, বীমা কোম্পানির রসিদটাও সঙ্গে

রাখছে ওরা। সকালের দিকে মন্টোগোমারি স্ট্রীটের প্রাসাদে বিদায়-সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। এত উত্তেজিত বোধ করছিলেন টার্টলেট, বসতে পারেননি, সারাক্ষণ টেবিলের কিনারা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর একের পর এক শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস খালি করেছেন। এটা যে তাঁর ভয় তাড়াবার চেষ্টা, তা আর কাউকে বলে দিতে হলো না। দেখা গেল পকেট-বেহালাটা সঙ্গে করে আনতে ভুলে গেছেন তিনি, বাধ্য হয়ে লোক পাঠাতে হলো তাঁর বাড়ি থেকে সেটা আনার জন্যে।

শেষ বিদায় জানানো হলো জাহাজের ডেকে। করমর্দনের পালা চুকল জাহাজের সিঁড়িতে।

'আসি, ফিনা।'

'এসো, গডফ্রে।'

কোল্ডেরুপ বললেন, 'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

স্বপ্ন রওনা হলো। ডেক আর জেটি থেকে রুমাল নাড়া হচ্ছে। একটু পরই সানফ্রান্সিসকো উপসাগরের মুখে স্থাপিত স্বর্ণতোরণ পার হয়ে এল স্বপ্ন। সামনে খোলা প্রশান্ত মহাসাগরের সীমাহীন চঞ্চল জলরাশি আপন খেলায় মত্ত। তারপর, যেন চিরকালের জন্যে, জাহাজের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল স্বর্ণতোরণটি।

পাঁচ

আরাম-আয়েশের কোন অভাব নেই জাহাজে। নিজের কেবিনের

যেদিকে সবচেয়ে বেশি আলো পড়ে সেদিকের দেয়ালে ফিনার ফটোটা ঝুলিয়েছে গডফ্রে। বিছানাটা তার বিশাল দোলনা। বাথরুমটা কেবিন সংলগ্ন। কেবিনে লেখাপড়ার জন্যে একটা টেবিল দেয়া হয়েছে। কাপড়চোপড় রাখার জন্যে একটা ওয়ার্ড্রোবও আছে। এত রকম সুযোগ-সুবিধে পেলে সারাজীবনই সে বেড়িয়ে কাটাতে পারে। গডফ্রের মনে ফুর্তি আর ধরে না। দিনগুলো তার বড়ই আনন্দে কাটছে।

কিন্তু টার্টলেটের দিনকাল তেমন ভাল যাচ্ছে না। গডফ্রের কেবিন থেকে তার কেবিন খুব একটা দূরে নয়, তবে আকারে তাঁরটা বেশ ছোট। বিছানাটাও খুব শক্ত। কেবিনে মাত্র ছয় বর্গগজ মেঝে, নাচুনে একজোড়া পায়ের জন্যে এই জায়গা খুব কম হয়ে গেল না?

জুন মাসের আবহাওয়া অনুকূলই থাকল। উত্তর-পুব দিক থেকে শান্ত বাতাস বইছে। ক্যাপটেন টারকট পুরোদমে এঞ্জিন চালিয়ে ফুল স্পীড তুললেন, তারপর ওড়ালেন সবগুলো পাল, রাজহাঁসের মত দ্রুতবেগে পানি কেটে ছুটছে স্বপ্ন। সাগর শান্ত থাকায় সী-সিকনেস কাউকে কাবু করতে পারল না। দেখতে দেখতে মার্কিন উপকূল দিগন্তের আড়ালে হারিয়ে গেল।

প্রথম দু'দিন উল্লেখ করার মত কিছুই ঘটল না। সূর্য যখন মধ্যরেখা পেরোয়, রোজই ক্যাপটেন টারকট তাঁর খাতায় সমস্ত তথ্য টুকে রাখেন। তারপর মেটকে নিয়ে নিজের কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। বদ্ধ ঘরের ভেতর ফিসফাস করেন তাঁরা। কি বিষয়ে গোপন আলোচনা হয় বোঝা যায় না। কেবিন থেকে বেরিয়ে এলে দেখা যায়, দু'জনেই দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কি নিয়ে তাঁদের এত উদ্বেগ তা কাউকে বলেন না।

গডফ্রে অবশ্য এ-সব কিছুই খেয়াল করল না। জাহাজ চালানো সম্পর্কে তার তো কোন অভিজ্ঞতাই নেই। কিন্তু ক্যাপটেন আর জাহাজের আচরণে মাল্লারা খুবই বিস্মিত হলো। রওনা হবার পর এক হপ্তার মধ্যে, আবহাওয়া যখন শান্ত ও স্বাভাবিক, পরপর কয়েক রাত 'চুপিচুপি' বদলে দেয়া হলো জাহাজের গতিপথ। ব্যাপারটা অত্যন্ত রহস্যময়, অথচ ক্যাপটেন বা মেটের কাছ থেকে এর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না।

তারপর বারো তারিখে জাহাজে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। তখন সকাল। এক টেবিলে নাস্তা খেতে বসেছেন ক্যাপটেন টারকট, মেট ও গডফ্রে। হঠাৎ ডেক থেকে একটা গোলযোগের আওয়াজ ভেসে এল। এক মুহূর্ত পর ডাইনিংরুমের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে একজন মাল্লা। সে চিৎকার করে বলল, 'ক্যাপটেন টারকট!'

টেবিল ছেড়ে ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্যাপটেন 'কী ব্যাপার?'

'জাহাজে এক চীনাকে পাওয়া গেছে!'

'কি বললে? জাহাজে চীনাম্যান?'

'হ্যাঁ, ক্যাপটেন! জলজ্যান্ত একটা চীনা লোক। অদ্ভুত ব্যাপার, লোকটা জাহাজের খোলে লুকিয়েছিল। হঠাৎ আমরা তাকে দেখতে পেয়েছি।'

'এ কিভাবে সম্ভব! একটা লোক জাহাজের খোলে লুকিয়ে থাকল, অথচ আমরা জানতেই পারলাম না?'

'কিভাবে জানতে পারব! লোকটা লুকিয়ে ছিল পাটাতনের তলায়।'

'ব্যাটাকে তাহলে সাগরের তলায় চালান করে দাও,' কঠিন সুরে নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন টারকট।

মাল্লা লোকটা চোখ বড় বড় করে মাথা ঝাঁকাল, বলল, 'জ্বী, হুজুর, আপনার নির্দেশ মতই কাজ হবে।' ক্যালিফোর্নিয়ার লোকজন চীনাদের দু'চোখে দেখতে পারে না, চীনদেশ সম্পর্কেও তাদের বিতৃষ্ণা প্রবল। মাল্লা লোকটা ক্যাপটেনের নির্দেশ খুশি মনেই পালন করবে।

তবে মাল্লার পিছু নিয়ে ক্যাপটেন টারকট সেই মুহূর্তে জাহাজের ফোরক্যাসলের দিকে ছুটে এলেন ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে, তাঁর সঙ্গে থাকল মেট ও গডফ্রে।

ইতিমধ্যে দু'তিনজন খালাসী চীনা লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে। বেচারাকে একা পেয়ে দু'চারটে কিল-ঘুসি মারতেও ছাড়ছে না। লোকটার বয়স খুব বেশি হলে চল্লিশ হবে। সুঠাম স্বাস্থ্য। চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। হাবভাব দেখে বোঝা যায়, লোকটা চটপটে। তবে আলো-বাতাসহীন খুপরিতে কয়েক দিন থাকায় বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। ক্যাপটেনের নির্দেশে খালাসীরা তাকে ছেড়ে দিল। লোকটাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি? তোমার পরিচয় কি?'

'আমি সূর্যসন্তান।'

'নাম বলো।'

'আমার নাম সেংভু,' লোকটা বলল। চীনা ভাষায় সেংভু অর্থ –যে বাঁচে না।

'ব্যাখ্যা করো, এই জাহাজে তুমি কি করছ?'

'চেয়েছিলাম আপনাদের জাহাজে চড়ে সাগর পাড়ি দেব,' ম্লান সুরে বলল সেংভু। 'আমি কারও কোন ক্ষতি করিনি।'

'জাহাজ ছাড়ার আগেই খোলের মধ্যে লুকিয়েছিলে, তাই না?'

'জ্বী, হুজুর।'

'বিনা পয়সায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে চীনদেশে যাবার মতলব?'

'হুজুর যদি দয়া করে নিয়ে যান...'

'কিন্তু যদি দয়া না করি? যদি বলি, ওহে হলুদ ওরাংওটাং, তুমি সাঁতার কেটে নিজের দেশে ফিরে যাও?'

'যদি আমাকে সাগরে ফেলেই দেন, সেই চেষ্টাই করতে হবে আমাকে,' বলল সেংভু। 'তবে তাতে সলিল সমাধি ঘটবার সম্ভাবনাই বেশি।'

'তুমি বোধহয় চাইছই আমরা তোমাকে সাগরে ফেলে দিই, যাতে শাস্তিটা এড়িয়ে যেতে পারো ক্যাপটেন টারকট গম্ভীর হলেন। 'কিন্তু আমি তোমাকে এত সহজে পার পেতে দেব না।'

এই পর্যায়ে ব্যাপারটায় নাক গলাল গডফ্রে। সে যুক্তি দিল, 'স্বপ্নে একজন চীনা থাকার অর্থই হলো ক্যালিফোর্নিয়ায় একজন চীনা কম থাকা।' তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপটেন, আপনার কি মনে হয় না যে ক্যালিফোর্নিয়ায় চীনাদের সংখ্যা এমনিতেই খুব বেশি?'

'হ্যাঁ, খুব বেশি।'

'কাজেই এই লোকটা যখন স্বেচ্ছায় ক্যালিফোর্নিয়া ত্যাগ করেছে, ওকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। ইচ্ছে করলে ওকে আমরা সাংহাই বন্দরে অনায়াসে নামিয়ে দিতে পারি।'

যুক্তরাষ্ট্রে চীনাদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে ব্যাপারটা নিয়ে মার্কিনীরা রীতিমত আতঙ্কিত। গডফ্রের প্রস্তাবে ক্যাপটেন টারকট অগত্যা রাজি হয়ে গেলেন। এরপর সেংভুকে জেরা করা হলো।

সানফ্রান্সিসকোয় ফরাসীদের অনেক থিয়েটার আছে, সেংভু এরকম একটা থিয়েটারে অভিনয় করে। সে আসলে কৌতুকাভিনেতা। কিন্তু লোক হাসিয়ে পেট ভরলেও, মনটা দেশে ফেরার জন্যে আকুলিবিকুলি শুরু করেছিল, সেজন্যেই গোপনে এই জাহাজে উঠে লুকিয়ে থাকে সে। আশা ছিল, কারও চোখে

ধরা না পড়ে চীনদেশে পৌঁছাতে পারবে। সঙ্গে খাবারদাবার ছিল, সে-সব ফুরিয়ে গেলে জাহাজের খাবার চুরি করে খেত। ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অপরাধ এমন গুরুতর নয় যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে।

সেংভুর সাজা মাফ হয়ে যাওয়ায় এখন আর তাকে খোলের ভেতর লুকিয়ে থাকতে হবে না। ডেকেই তার থাকার ব্যবস্থা হলো। তবে সে কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। মাঝি-মাল্লাদের পারতপক্ষে এড়িয়েই চলে। খায়ও নিজের খাবারই।

পরবর্তী তিন দিন তাপমাত্রা শুধু নামতেই থাকল। আবহাওয়াও খামখেয়ালী শুরু করেছে–হঠাৎ ঝম ঝম বৃষ্টি, কখনও বা এলোমেলো মাতাল বাতাস। বাতাসের দিকও বদলে গেছে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ছুটছে এখন। সুযোগ বুঝে বেয়াড়া হয়ে উঠেছে ঢেউগুলোও, স্বপ্নকে মাঝেমধ্যেই ফেনার মাথায় তুলে ধরছে, পরমুহূর্তে আবার সবেগে নামিয়ে আনছে দুই জলস্তম্ভের মধ্যবর্তী গভীর খাদে। এলোমেলো মাতাল বাতাসে পালগুলো কোন কাজে আসছে না, ওগুলো খুলে রাখা হয়েছে। স্বপ্ন এগোবার চেষ্টা করছে পুরোপুরি এঞ্জিনের ঘাড়ে চেপে। ক্যাপটেন এঞ্জিনটাকে পুরোদমে চালাতে নিষেধ করলেন, কারণ বয়লারের ওপর বেশি চাপ পড়লে সমস্যা হতে পারে।

এরকম আবহাওয়ায় স্বপ্ন ভাঙছে না, তবে খুব ঝাঁকি খাচ্ছে। জাহাজের অবিরাম দোল হাসিমুখেই মেনে নিল গডফ্রে। এরইমধ্যে সাগরকে ভালবেসে ফেলেছে সে, কাজেই এক-আধটু অত্যাচার সহ্য করতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু অধ্যাপক টার্টলেটের দৃষ্টিতে সাগর হলো পরম শত্রু। ঢেউ আর বাতাস স্বপ্নকে নিয়ে যত বেশি খেলছে টার্টলেটও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তার দীর্ঘকালের অভ্যাস নৃত্যের তালে তালে পা ফেলে হাঁটাচলা করা, কিন্তু অশান্ত সাগরে সচল কোন জাহাজের ডেকে সেভাবে পা ফেলা সম্ভব নয়—প্রতিবারই যেখানে পড়ার কথা সেখানে পা ফেলতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। এরকম বৈরি পরিবেশে নিজের কামরায় যে শুয়ে থাকবেন তারও উপায় নেই। জাহাজের এই দুলুনি তাঁকে এমন অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে যে কোথাও তিনি স্থির হয়ে শুতে বা বসতে পারছেন না। এ এক অদ্ভুত উভয়সঙ্কটই বটে। না তিনি স্থির হতে পারেন, না অস্থির হতে। নিজের কামরায় দাঁড়িয়ে ভয় পাচ্ছেন তিনি, এবার নির্ঘাত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। অস্তিত্ব বিপন্ন হলে মানুষ অনেক অদ্ভুত কাণ্ড করে। টার্টলেট নিজের কেবিন থেকে ডেকে আশ্রয় পাবার আশায় ছুটে এলেন। কিন্তু এখানে আসার পর দেখা গেল জাহাজ যখন যেদিকে কাত হচ্ছে, তিনিও সেদিকে গড়াচ্ছেন—পালা করে একবার এদিক আসছেন, একবার ওদিক যাচ্ছেন। এভাবে গড়াতে থাকলে প্রাণবায়ুকে বেশিক্ষণ শরীরের ভেতর ধরে রাখা যাবে না, এটা উপলব্ধি করে একদিকের রেইলিং আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন টার্টলেট। তাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে হাত বাড়ালেন দড়ি-দড়ার দিকে। কিন্তু সেগুলোও হাত থেকে এক সময় ছুটে গেল। জাহাজের ডেকে এই যে দাপাদাপি শুরু করেছেন তিনি, আধুনিক নৃত্যশিল্পের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়াটা নেহাতই বাতুলতা হবে।

টার্টলেট ভাবছেন, জাহাজ ও সাগরের এই অত্যাচার থেকে বাঁচার একটাই উপায়, বেলুনের মত তিনি যদি হুস করে আকাশে উঠে যেতে পারতেন! কোল্ডেরুপের প্রতি মনটা তাঁর বিরূপ হয়ে উঠল। এ তাঁর খামখেয়াল ছাড়া কী, এত থাকতে একজন নৃত্যশিক্ষককে ভাগ্নের সহযাত্রী করে পাঠিয়েছেন! দিনে অন্তত

বিশ-পঁচিশবার ক্যাপটেন টারকটকে প্রশ্ন করছেন তিনি, 'এই বিচ্ছিরি আবহাওয়া কতদিন থাকবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না,' নির্লিপ্ত সুরে জবাব দেন ক্যাপটেন। 'সত্যি কথা বলতে কি, ব্যারোমিটারের ভাবসাব আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'খুব তাড়াতাড়ি, মানে দু'একদিনের মধ্যে ডাঙায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যায় না?' কাতর কণ্ঠে জানতে চাইলেন টার্টলেট।

'কি বললেন? দু'একদিনের মধ্যে ডাঙায় পৌঁছাতে চান?' তিক্ত হাসি ফুটল ক্যাপটেনের মুখে। 'ও, বুঝেছি, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন!'

সাগরের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন টার্টলেট। 'হায়! অথচ একেই লোকে প্রশান্ত মহাসাগর বলে!'

টার্টলেট শুধু যে সী-সিকনেসে আক্রান্ত হয়েছেন, তা নয়, তিনি জলাতঙ্কেও ভুগছেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁর ভয় লাগছে, পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউগুলো স্বপ্নকে গ্রাস করবে, জাহাজের সঙ্গে তিনিও ডুবে যাবেন।

ক্যাপটেনের কাছ থেকে কোন রকম আশ্বাস না পেয়ে ছাত্রের কাছে ছুটে এলেন অধ্যাপক। 'শুনছ, গডফ্রে, আমাদের আসলে বেঁচে থাকার কোন আশা নেই। প্রশান্ত মহাসাগর যদি শান্ত না হয়, সবাইকে ডুবেই মরতে হবে।'

শিক্ষককে নরম সুরে অভয় দিল গডফ্রে। 'আপনি শুধু শুধু আতঙ্কিত হচ্ছেন। আমি যেভাবে বলি সেভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, জাহাজ কেন বানানো হয়?'

'নিজেকে প্রশ্ন করব?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন টার্টলেট। 'বেশ, করলাম–জাহাজ কেন বানানো হয়?'

'তারপর নিজেই উত্তর দিন–জাহাজ বানানো হয় ভেসে থাকার

জন্যে।'

'জাহাজ বানানো হয় ভেসে থাকার জন্যে,' আবৃত্তি করলেন টার্টলেট।

'একটা জাহাজ কেন ভেসে থাকবে, এর পিছনে অনেক যুক্তি আছে।'

'একটা জাহাজ কেন ভেসে থাকবে, এর পিছনে অনেক যুক্তি আছে।'

'এবার,' ছাত্র গডফ্রে পরামর্শ দিল, 'কল্পনাশক্তির সাহায্যে, মাথা খাটিয়ে যুক্তিগুলো খুঁজে বের করুন, মুখে উচ্চারণ করে নিজেকে শোনান। দেখবেন, সমস্ত অকারণ ভয় আপনার মন থেকে মুছে গেছে।'

টার্টলেট চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালেন, বলা যায় মুহূর্তে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন 'সব বাজে কথা, গডফ্রে! যে-কোন জাহাজের স্বাভাবিক পরিণতি ডুবে যাওয়া। জাহাজ না বানানো হলে ডোবার মত কিছু থাকত না, এটাই সহজ যুক্তি। যেহেতু বানানো হয়েছে, কাজেই ওটা ডুববে।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল গডফ্রে।

ছাত্রের চুপ করে থাকাটাকে হেরে গিয়ে চুপসে যাওয়া হিসেবে গণ্য করলেন টার্টলেট, এবং জাহাজ নির্ঘাত ডুববে ধরে নিয়ে কোমরে একটা লাইফ-বেল্ট বেঁধে নিলেন। সেই থেকে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা শরীরে শোভা পাচ্ছে ওটা। সাগর ধমক দিলে বা হুমকি দিলে সেটাকে আরও আঁটো করে বাঁধেন, ফুঁ দিয়ে আরও একটু বেশি ফোলাবার চেষ্টা করেন বেলুনটাকে। কিন্তু যতই ফোলান, সেটা যথেষ্ট ফুলেছে বলে কখনোই তাঁর মনে হয় না

টার্টলেটের এই সাগর-ভীতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখা উচিত। প্রথমবার যারা সাগর-পাড়ি দিচ্ছে তাদের পক্ষে ঢেউয়ের এই

নিষ্ঠুর প্রলয়নৃত্য সহ্য করা সত্যি অত্যন্ত কঠিন।

আবহাওয়া কিন্তু সত্যি দিনে দিনে আরও খারাপের দিকেই যাচ্ছে। প্রচণ্ড একটা ঝড় হবে, তার সমস্ত লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠছে। ক্যাপটেন টারকট সাবধানী মানুষ, এঞ্জিনের ক্ষতি এড়াবার জন্যে হাফ স্পীডে স্বপ্নকে চালাচ্ছেন তিনি। ঢেউ প্রতি মুহূর্তে জাহাজটাকে তুলে আছাড় মারছে। প্রপেলারগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তে আবার ঘুরতে ঘুরতে চারপাশে পানি ছিটিয়ে উঠে আসছে। জাহাজের খোল ম্যালেরিয়ার রোগীর মত সারাক্ষণ থরথর করে কাঁপছে।

একটা ব্যাপার খুব রহস্যময় লাগল গডফ্রের। অনেক চেষ্টা করেও এই রহস্যের কোন কিনারা করতে পারেনি সে। দিনের বেলা স্বপ্ন প্রচণ্ড ঝাঁকি খায়, এমন দুলতে থাকে যে পেটের সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আসার যোগাড় হয়। কিন্তু রাতে এই ঝাঁকি আর দোল কি কারণে কে জানে অনেক কমে যায়। এই রহস্যের ব্যাখ্যা কি? সূর্য ডোবার পর আবহাওয়া শান্ত হয়ে যায়? প্রতিদিন? নাহ্, তা কি করে হয়!

একুশে জুন পার হয়ে যাচ্ছে। সেদিন রাতে রহস্যটা নিয়ে চিন্তা করছিল গডফ্রে, মাথাটা তার গরম হয়ে উঠল। জেদ চাপল, এর একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তাকে পেতেই হবে। রোজকার মত আজও দিনের বেলা প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে স্বপ্ন, সারাক্ষণ দুলেছে। সারাটা দিনই বাতাসের গতি ছিল প্রবল। তখন একবারও মনে হয়নি যে রাতে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু সন্ধে হতেই দেখা গেল সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাতাসও কম, সাগরও উত্তাল নয়। অদ্ভুত নয়?

গরম কাপড়ে নিজেকে মুড়ে ডেকে বেরিয়ে এল গডফ্রে।

লুকআউট, অর্থাৎ পাহারাদাবরা গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। ক্যাপটেন টারকটকে দেখা গেল সিঁড়ির ধাপে। গডফ্রে লক্ষ করল বাতাসের গতি আগের মতই আছে, একটুও কমেনি, কিন্তু ঢেউগুলোকে দিনের বেলা যেমন ফণা তুলতে দেখা গিয়েছিল, এখন তেমন দেখা যাচ্ছে না। এর রহস্য কি? গডফ্রের জন্যে অবশ্য আরও একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সে দেখল, জাহাজের চিমনি থেকে ওঠা ধোঁয়া একটা রেখা তৈরি করে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে।

'তারমানে কি বাতাস দিক বদল করেছে?' আপনমনে বিড় বিড় করল গডফ্রে।

ক্যাপটেনের দিকে এগোল সে। 'ক্যাপটেন?'

ক্যাপটেন টারকট প্রথমে গডফ্রেকে দেখতেই পাননি। হঠাৎ তাঁকে একেবারে গায়ের কাছে দেখে একটু যেন বিরক্তই হলেন। 'আপনি, মি. গডফ্রে? এত রাতে? খোলা ডেকে?'

'হ্যাঁ, ক্যাপটেন টারকট। আমি জানতে চাই...'

'কি?' প্রশ্নটা যেন বোমার মত বিস্ফোরিত হলো।

'আমি জানতে চাই, বাতাস কি হঠাৎ দিক বদলেছে?'

'না তো, মি. গডফ্রে!' সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ সুরে জবাব দিলেন টারকট। 'অবশ্যই বাতাস দিক বদলায়নি। তবে এটুকু বলতে পারি যে প্রচণ্ড একটা ঝড় আসছে।'

'বাতাস দিক বদলায়নি, ঠিক জানেন? তাহলে চিমনির ধোঁয়া জাহাজের পিছন দিকে ছুটছে কেন?'

'পিছন দিকে ছুটছে!' কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন ক্যাপটেন টারকট। 'ও, হ্যাঁ!' যেন এই প্রথম ব্যাপারটা খেয়াল করলেন তিনি। রীতিমত বিচলিত দেখাল তাঁকে। 'কিন্তু ধোঁয়া পিছন দিকে যাচ্ছে তো আমি কি করব? এতে আমার কোন দোষ নেই।'

'আপনার দোষ? আপনাকে কে দোষী করছে? আমি শুধু জানতে চাইছি, ধোঁয়াটা পিছন দিকে যাচ্ছে কেন?'

'কেন আবার, প্রচণ্ড একটা ঝড় আসছে, সেই ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে জাহাজকে আমি উল্টোদিকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'সে কি!' প্রায় আঁতকে উঠল গডফ্রে। 'তাহলে তো গন্তব্যে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে আমাদের!'

'তা একটু দেরি হবে বৈকি। তবে সকালে যদি দেখি সাগর শান্ত হয়ে এসেছে, তাহলে আবার আগের মত পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাব।' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন ক্যাপটেন। 'মি. গডফ্রে, আপনি বরং নিজের কেবিনে ফিরে যান। আপনার জন্যে সেটাই সবদিক থেকে ভাল হবে। আমি আপনার ভাল চাই, তাই আমার পরামর্শ ফেলে দেবেন না–যান, কেবিনে শুয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করুন। তা না হলে...'

'তা না হলে কি?' প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল গডফ্রে।

'তা না হলে কাল সকালে নড়ার শক্তিও পাবেন না, অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়বেন

ক্যাপটেন ফণা নামাতে গডফ্রেও আর কথা বাড়াল না, ফিরে চলল কেবিনের দিকে। ফেরার সময় লক্ষ করল, মেঘের মিছিল এত নিচে নেমে এসেছে, যেন হাত বাড়ালে ছোঁয়া যাবে, পড়িমরি করে ছুটছে উল্টোদিকে। গডফ্রের মনে হলো, ঝড় বোধহয় সত্যি একটা আসবে। তাড়াতাড়ি কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়ল সে।

কিন্তু রাতে কোন ঝড় এল না। সকালে বাতাসের গতি বরং কমে গেল। দিক বদলে আবার পশ্চিমে ছুটছে স্বপ্ন।

পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা এই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল–জাহাজ দিনে পশ্চিমমুখো ছোটে, রাতে ছোটে পুবমুখো। ব্যারোমিটারের

কাঁটা সামান্য ওপর দিকে উঠেছে, আশা করা যায় আবহাওয়ার দ্রুত উন্নতি ঘটবে, বাতাসও বইতে শুরু করবে উত্তরে।

ঘটলও তাই। পঁচিশ তারিখ সকাল আটটায় ডেকে এসে দাঁড়াল গডফ্রে। উত্তর থেকে পুব দিকে বইছে বাতাস, মেঘের মিছিলগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অকস্মাৎ চারদিকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে সূর্যও বেরিয়ে এল সাগরের রঙ গাঢ় সবুজ, রোদ লেগে ঝিকিয়ে উঠল। প্রায় শান্ত ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনার মুকুট। নিচের দিকের সবগুলো পাল টাঙিয়ে দিতেই বাতাসে ফুলে উঠল।

চোখে দূরবীন, মেট দাঁড়িয়ে আছে গলুইয়ের কাছে। এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল গডফ্রে। 'কালকের চেয়ে আজকের দিনটা বেশ শান্তই, কি বলেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মেট, 'মি. গডফ্রে। সাগরের শান্ত দিকটায় সরে এসেছি আমরা।'

'জাহাজ তাহলে তার নিজের পথ ধরেই এগোচ্ছে?'

'না, এখনও সেটা সম্ভব হচ্ছে না।'

'মানে? কি বলতে চান আপনি?'

'কেন, আপনি জানেন না, মি. গডফ্রে? ক'দিন কি রকম তীব্র বাতাস ছিল, লক্ষ করেননি? বাতাসের ধাক্কায় অনেকটা উত্তর-পুব দিকে সরে এসেছে জাহাজ। ঠিক পথ ধরতে হলে প্রথমে তো জানতে হবে এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছি আমরা।'

'তা জানা কি এমন কঠিন!' ভুরু কুঁচকে বলল গডফ্রে। 'আকাশে সূর্য রয়েছে, আলোর তো কোন অভাব নেই! দিগন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এটা একটা প্রশ্ন হলো–এই মুহূর্তে কোথায় রয়েছি!'

'সাগর কি এতটুকু একটা জিনিস যে আলো থাকলেই বোঝা

যাবে কোথায় রয়েছি!' গডফ্রের অজ্ঞতা দেখে হাসল মেট। 'সূর্য মাথার ওপর উঠুক, তখন বোঝা যাবে ঠিক কোথায় আমাদের অবস্থান। সেই অবস্থান জানার পরই কেবল জাহাজ চালাবার হুকুম দেবেন ক্যাপটেন টারকট।'

এই প্রথম খেয়াল করল গডফ্রে, জাহাজ চলছে না! ঘাবড়ে গিয়ে সে জানতে চাইল, 'ক্যাপটেন কোথায়? তাঁকে কোথাও দেখছি না কেন?'

'ক্যাপটেন? ক্যাপটেন নেই।'

'নেই মানে?' হাঁ হয়ে গেল গডফ্রে।

'ও, আপনি তাহলে কিছুই জানেন না!' আবার হাসল মেট। 'লুকআউট রিপোর্ট করল, পুবদিকে বিশাল সব ঢেউ দেখা যাচ্ছে। শান্ত সাগরে বিশাল ঢেউ মানে হলো, কাছাকাছি কোথাও সম্ভবত ডাঙা আছে। অথচ মানচিত্রে ডাঙার চিহ্নমাত্র নেই। তাই স্টীম লঞ্চ নিয়ে দেখতে গেছেন ক্যাপটেন টারকট। তাঁর সঙ্গে চারজন মাল্লাও আছে।'

'কখন গেছেন তিনি? কতক্ষণ আগে?'

'অনেকক্ষণই তো হলো। ঘণ্টা দেড়েকের কম নয়।'

মুখ ভার করে গডফ্রে বলল, 'আমাকে একটা খবর দিতে পারতেন। তাহলে ওদের সঙ্গে আমিও যেতাম।'

'আপনি হয়তো তখন ঘুমাচ্ছিলেন, মি. গডফ্রে। ক্যাপটেন সম্ভবত আপনার ঘুম ভাঙাতে চাননি।'

গডফ্রে জানতে চাইল, 'কোন দিকে গেল লঞ্চটা?'

'উত্তর-পুবে।'

'চোখে দূরবীন লাগিয়ে কি দেখছিলেন? লঞ্চটাকে?'

'খুঁজছিলাম, হ্যাঁ। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। অনেক দূরে চলে গেছে কিনা।'

'ফিরতে কি দেরি হবে?'

'না-না, ক্যাপটেন দেরি করবেন না। সাগরের মেজাজ, সূর্যের অবস্থান ইত্যাদি ওনাকেই তো সব দেখতে হবে–অবশ্যই দুপুরের আগে ফিরে আসবেন তিনি।'

একটা দূরবীন নিয়ে গলুইয়ের একেবারে মাথার কাছে বসে পড়ল গডফ্রে। তাকেও সঙ্গে নেয়া হয়নি, সেজন্যে মন খারাপ ঠিকই, কিন্তু ক্যাপটেনের আচরণের পিছনে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে সে। বড় আকারের ঢেউ কেন উঠছে, এটা জানা খুবই জরুরী। কাছাকাছি ডুবোপাহাড় থাকলে এরকম বড় ঢেউ উঠতে পারে। জাহাজের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেহেতু ক্যাপটেনের, তাঁকেই তো সব দেখতে হবে।

পৌনে এগারোটার দিকে ফিরে এল লঞ্চ। ক্যাপটেন জাহাজে পা দিতেই ছুটে এল গডফ্রে। জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখলেন, ক্যাপটেন?'

হাসিমুখে ক্যাপটেন টারকট বললেন, 'গুডমর্নিং, মি. গডফ্রে।'

'আমি ঢেউগুলোর কথা জানতে চাইছি...'

'ও, ঢেউগুলো! নাহ্, ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। লুকআউট সম্ভবত ভুলই করেছে।'

'এখন তাহলে আমরা নিজেদের পথে এগোব?'

'অবশ্যই। তবে তার আগে জেনে নিতে হবে ঠিক কোথায় রয়েছি আমরা।'

মেটকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ক্যাপটেনকে সে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, লঞ্চটা কি আমরা জাহাজে তুলব?'

'না, জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রাখো,' বললেন ক্যাপটেন। 'পরে কাজে লাগতে পারে।'

দুপুর বারোটায় সেক্সটান্ট কম্পাসের সাহায্যে সূর্যের নিখুঁত

অবস্থান নির্ণয় করলেন ক্যাপটেন, তারপর নির্দেশ দিলেন জাহাজ কোনদিকে যাবে। দিগন্তের দিকে একবার মাত্র চোখ তুলে তাকালেন তিনি, তারপর মেটকে ইঙ্গিতে পিছু নিতে বলে সোজা গিয়ে ঢুকলেন নিজের কেবিনে। মেট ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বদ্ধ ঘরের ভেতর আবার তাঁরা গোপন আলোচনায় বসেছেন।

দিনটা আজ শান্তিময়। ফুলস্পীডে ছুটছে স্বপ্ন। বাতাসে তেমন জোর না থাকায় পাল টাঙানো হয়নি। অনেকদিন পর অধ্যাপক টার্টলেটকে ডেকে নাচতে দেখা গেল। তবে গডফ্রের শত অনুরোধেও কোমর থেকে লাইফ-বেল্টটা খুলতে রাজি হলেন না।

সন্ধ্যার দিকে ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। গডফ্রের মনে একটা ভয় ঢুকল। একে রাত, তারপর কুয়াশা, জাহাজ যদি কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খায়, নির্ঘাত ডুবে মরতে হবে। ক্যাপটেনের নির্দেশে সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের সবগুলো লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মাস্তুলে ঝুলছে বড় আকারের একটা লণ্ঠন, সাদা আলো ছড়াচ্ছে। বাম দিকে জ্বলছে টকটকে লাল আলো, আর ডান দিকে গাঢ় সবুজ।

নিজের কেবিনে ফিরে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল গডফ্রে।

রাত একটার দিকে প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো। ঘুমের মধ্যেই শিউরে উঠল গডফ্রে। পরমুহূর্তে ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। হৃৎপিণ্ড এমন লাফাচ্ছে, মনে হলো বুকটা ফেটে যাবে। বিছানা থেকে নেমে দ্রুত কাপড় পরছে, শুনতে পেল ডেকে লোকজন চিৎকার করছে, 'জাহাজ ডুবে যাচ্ছে! জাহাজ ডুবে যাচ্ছে!'

এক লাফে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল গডফ্রে। ডাইনিং রুমের মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে কে যেন, আগে দেখতে না

পাওয়ায় তার সঙ্গে ধাক্কা খেলো সে। ভাল করে তাকাতে চিনতে পারল–অধ্যাপক টার্টলেট!

জাহাজের সব লোক ছুটে বেরিয়ে এসেছে ডেকে। মেট আর ক্যাপটেনকে ছুটোছুটি করতে দেখল গডফ্রে। দু'জনই খুব উত্তেজিত। 'কি হয়েছে?' হড়বড় করে জিজ্ঞেস করল সে। 'কিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগল?'

'কি করে বলব!' অসহায় একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল মেট। 'কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবে জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে।'

'ডুবে যাচ্ছে? জাহাজ ডুবে যাচ্ছে?' গডফ্রের কান্না পাচ্ছে।

কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। গডফ্রে আন্দাজ করল, নিশ্চয়ই কোন ডুবোপাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে জাহাজ। স্বপ্ন যে ডুবছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরইমধ্যে ডেকের নাগাল পেয়ে গেছে পানি। তারমানে ইতিমধ্যে নিচের এঞ্জিন রুমে পানি ঢুকে পড়েছে।

'লাফ দিন! ঝাঁপিয়ে পড়ুন! মি. গডফ্রে, দোহাই লাগে, এখুনি লাফিয়ে পড়ুন!' চিৎকার করছেন ক্যাপটেন টারকট। 'দেখতেই তো পাচ্ছেন, স্বপ্নকে আমরা রক্ষা করতে পারব না। সময় থাকতে লাফ দিন। জাহাজ যখন ডুববে, পানিতে প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি তৈরি হবে, লাফ দিতে দেরি করলে ওই ঘূর্ণিতে পড়ে তলিয়ে যাবেন...'

গডফ্রে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল। তবে নিজের কথা না ভেবে প্রথমেই সে তার নৃত্যশিক্ষক অধ্যাপক টার্টলেটের কথা ভাবল। 'মি. টার্টলেটের কি হবে?'

'আপনি আর দেরি করবেন না, প্লীজ, এখুনি লাফ দিন,' বললেন ক্যাপটেন। 'মি. টার্টলেটকে আমি দেখছি। ডাঙা খুব কাছেই, একটু সাঁতার কাটলেই পৌঁছে যাবেন...'

'কিন্তু আপনি...আপনার? আপনাদের কি হবে?'

'সবাই লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠবে,' বললেন ক্যাপটেন। 'একা শুধু আমি শেষ পর্যন্ত জাহাজে থাকব। আমি ক্যাপটেন, কাজেই সব লোক নিরাপদে চলে যেতে পারল কিনা তা তো আমাকেই দেখতে হবে...লাফ দিন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন!'

গডফ্রে যে দক্ষ সাঁতারু, ক্যাপটেন টারকটের তা ভালই জানা আছে।

সাঁতার জানলে কি হবে, এখনও ইতস্তত করছে গডফ্রে। ইতিমধ্যে ডেকে পানি উঠতে শুরু করেছে। ক্যাপটেন গডফ্রেকে ইতস্তত করতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এগিয়ে এসে হঠাৎ তার পিঠে ধাক্কা দিলেন তিনি। এক ধাক্কাতেই সাগরে ছিটকে পড়ল গডফ্রে।

ক্যাপটেন আসলে গডফ্রের উপকারই করলেন। আরেকটু দেরি হলে জাহাজডুবির ফলে সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্তে পড়ত গডফ্রে, সেই সঙ্গে তলিয়ে যেত সাগরের তলায়। পানিতে পড়ে ডুব সাঁতার শুরু করল সে, ঘূর্ণির নাগাল থেকে অনায়াসে দূরে সরে এল। কয়েক মিনিট পরই নাবিক আর মাল্লারা আর্তনাদ শুরু করল। সাদা, লাল, সবুজ–জাহাজের সবগুলো লণ্ঠন নিভে গেল, সেই সঙ্গে গডফ্রের শেষ আশাও। স্বপ্ন ডুববে কি ডুববে না, সে প্রসঙ্গ এখন বাসি হয়ে গেছে। কারণ পানির ওপর সেটার আর কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে গেল, হারিয়ে গেল চিরকালের জন্যে।

খানিকটা সাঁতরাতেই ডাঙার নাগাল পেয়ে গেল গডফ্রে। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার, নিজের হাত পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। নিয়তি এ কোথায় তাকে টেনে নিয়ে এল? এত চিৎকার করে ডাকছে, অথচ কেউ সাড়া দিচ্ছে না কেন? এটা কি কোন

ডুবোপাহাড়ের চূড়া? নাকি কোন দ্বীপ? ভয় পেলেও গডফ্রে সাহস হারাল না। অধ্যাপক টার্টলেট, ক্যাপটেন টারকট আর মেটের নাম ধরে চিৎকার করছে সে।

কিন্তু ওরা কেউ সাড়া দিচ্ছে না। অন্ধকারে সাগরও দেখা যাচ্ছে না। তবে কি সে একা বেঁচে আছে, বাকি সবাই ডুবে গেছে জাহাজের সঙ্গে? ডাঙায় ওঠার পর কোনদিকে যাবে বুঝতে পারছে না গডফ্রে। জানে কোন সাড়া পাবে না, তবু এখনও মাঝে মধ্যে ওদের নাম ধরে ডাকছে।

গডফ্রে বুঝতে পারল, সূর্য না ওঠা পর্যন্ত এখানেই তাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ছয়

সূর্য উঠতে এখনও তিন ঘণ্টা বাকি। এক, দুই, তিন—সেকেন্ড গোনা শুরু করেছিল গডফ্রে, একঘেয়ে লাগায় এখন আর গুনছে না এক একটা মিনিট যেন একটা করে বছর। ঘুমিয়ে পড়া চলবে না, নিজেকে সাবধান করে দিল সে। নিজের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করলে সময়টা কাটানো সহজ হবে। শখ চাপায় অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে, এক-আধটু কষ্ট তো করতেই হবে! বিপদ যত ভয়ঙ্করই হোক, ঘাবড়ে যাওয়াটা পুরুষ মানুষের সাজে না।

আপাতত তার একটা আশ্রয় আছে। একটা পরিস্থিতিকে অনেকভাবে দেখা যায়। তার পায়ের তলায় মাটি আছে, এটা কম

কথা নয়। সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ডাঙায়, তবে ঢেউগুলো এখন আর তাকে সাগরে নিয়ে গিয়ে নাকানিচোবানি খাওয়াতে পারবে না। কিন্তু জোয়ারের সময় কি হবে? জোয়ারে যদি এই পাহাড়ের চূড়া ডুবে যায়?

জাহাজডুবি ঘটেছে ভরা জোয়ারের সময়, কাজেই আবার জোয়ার শুরু হতে দেরি আছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একটাই–এটা কি সত্যি একটা পাহাড়ের চূড়া, আর শুধু চূড়াটাই পানির ওপর মাথা তুলে রয়েছে? নাকি এটা আসলে বিশাল একটা দ্বীপের কিনারা? এক এক করে আরও প্রশ্ন জাগছে মনে। লঞ্চ নিয়ে ক্যাপটেন টারকট কি এখানেই এসেছিলেন? এটা কোন মহাদেশের তীর নয় তো? তারপর গডফ্রের মনে পড়ল, ক্যাপটেন টারকট বলেছিলেন, আশপাশে কোন ডাঙা নেই। লঞ্চ নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েও তিনি কোন ডাঙার সন্ধান পাননি। তাহলে? এখানে সে কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে?

না, ডাঙা আছে, এবং সেই ডাঙাতেই সে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপটেন আরেকটু খোঁজ করলে ঠিকই এটার সন্ধান পেতেন। সকাল হলে বোঝা যাবে এই ডাঙা আসলে মহাদেশ, পাহাড়চূড়া, নাকি কোন দ্বীপ।

গরম ওয়েস্টকোট আর ভিজে ভারী হয়ে ওঠা জুতো জোড়া খুলে ফেলল গডফ্রে। হঠাৎ প্রয়োজন দেখা দিলে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি থাকা উচিত। আচ্ছা, জাহাজের বাকি সবাই কি সত্যি ডুবে গেছে? আবার ওদের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করল সে। কিন্তু বৃথাই, কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

হঠাৎ গডফ্রে খেয়াল করল, এত চিৎকার করছে সে, অথচ তার চিৎকার প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করছে না। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। এর মানে হলো, আশপাশে কোন পাহাড় বা বাড়ি-ঘর নেই। তার

চিৎকার কোথাও বাধা পাচ্ছে না।

নানা রকম দুশ্চিন্তা আর অমঙ্গল আশঙ্কার ভেতর দিয়ে তিন ঘণ্টা পার হলো। হিম ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছে গডফ্রে। শরীরটা গরম রাখার জন্যে কিছুক্ষণ হলো হাঁটতে শুরু করেছে সে। পায়ের নিচে পাথর। ভোরটা ঘন কুয়াশায় ঢাকা, এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। আরও এক ঘণ্টা পর কুয়াশা হালকা হতে শুরু করল। তার সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে প্রকৃতি। কালো পাথর ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। চারদিকে উদ্ভট আকারের অসংখ্য পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। গডফ্রে আসলে একটা খুব বড় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও সামনে সাগরের পানি। পানির ওপারে আরও পাথর, সেগুলোও সব বিশাল আকারের, যেমন উঁচু তেমনি চওড়া। ঢেউগুলো ছুটে এসে যেভাবে ভাঙছে, সন্দেহ নেই সাগর এখানে খুব বেশি গভীর। সূর্যের অবস্থান আন্দাজ করতে পারায় দিক নির্ণয়ে কোন অসুবিধে হলো না। গডফ্রে পশ্চিম দিকে রয়েছে। রাশি রাশি পাথর খণ্ডের মাঝখানে যে পানি দেখা যাচ্ছে, ওটা আসলে একটা খাঁড়ি। খাঁড়ি পেরুলেই যে শুকনো ডাঙা পাওয়া যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

কুয়াশা আরও হালকা হলো। ধীরে ধীরে গডফ্রের সামনে উন্মুক্ত হলো শৈবাল ভরা সৈকত। তারপর চোখে পড়ল সারি সারি টিলা, তবে কোনটাই খুব বেশি উঁচু নয়, সবগুলো গ্র্যানিট পাথরে তৈরি। টিলাগুলো পুব দিগন্তটাকে আড়াল করে রেখেছে। 'ডাঙা! ডাঙা!' উল্লাসে নেচে উঠতে ইচ্ছে করল গডফ্রের। হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করল সে, কৃতজ্ঞতা জানাল ঈশ্বরকে।

কোন সন্দেহ নেই, ডাঙাই। গডফ্রের সামনে দু'মাইল লম্বা একটা সৈকত পড়ে আছে, ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে তীরে। উত্তর

আর দক্ষিণে একটা করে খাড়া টিলা, দৈর্ঘ্যে একেকটা পাঁচ-ছয় মাইলের কম হবে না। গডফ্রে আন্দাজ করল, এটা সম্ভবত কোন অন্তরীপের শেষপ্রান্ত। সে যাই হোক, সাময়িক আশ্রয় হিসেবে জায়গাটা মন্দ নয়।

এবার সাগরের দিকে মনোযোগ দিল গডফ্রে, আশা জাহাজ বা জাহাজের লোকজনকে হয়তো দেখতে পাবে। কিন্তু না, স্বপ্নের কোন চিহ্নমাত্র নেই সাগরে। জাহাজটা নেই, লঞ্চটাকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সাগর ফাঁকা, কোথাও কেউ ভাসছে না। ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হলেও, বাস্তব সত্য হলো সে একাই বেঁচে আছে। এখন থেকে সাহস করে প্রতিটি বিপদ একাই তার সামলাতে হবে। বেঁচে থাকতে হলে ভয় পাওয়া চলবে না।

মূল ডাঙায় পৌঁছাতে হলে বড় আকৃতির পাথরগুলো টপকাতে হবে। পানি ভেঙে হাঁটছে গডফ্রে, কখনও লাফ দিয়ে পার হচ্ছে। পাথরে শ্যাওলা জমেছে, কিছু পাথরের কিনারা ছুরির ফলার মত ধারাল। কাজেই খুব সাবধানে, দেখেশুনে এগোতে হচ্ছে তাকে। এভাবে সিকি মাইল হেঁটে ডাঙায় পা রাখল সে।

আস্তে আস্তে সমস্যাগুলো মাথাচাড়া দিচ্ছে। শুকনো কাপড়চোপড় দরকার তার। খিদে পেয়েছে, খাবার দরকার। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই, হঠাৎ যদি কোন হিংস্র জানোয়ার বা কোন জংলী হামলা করে বসে, নিজেকে সে রক্ষা করবে কিভাবে?

নিজেকে তিরস্কার করল গডফ্রে। তার মত বোকা দুনিয়ায় আর বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। বাড়িতে বসে কি আরামের জীবনযাপন করছিল। মাথায় ভূত চাপল, বিশ্বভ্রমণে বেরুবে। অ্যাডভেঞ্চারের শখ হলো! এখন মজা বোঝো!

মামা কোল্ডেরুপ আর বাগদত্তা ফিনার মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। আর কি কখনও ওদের সঙ্গে তার দেখা হবে!

বুকটা কেমন টনটন করতে লাগল গডফ্রের। চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল।

শ্যাওলা ঢাকা পিচ্ছিল পথটুকু পেরিয়ে এল গডফ্রে। পিছনে পড়ল বালির ঢিবি, উঁচু-নিচু জমিন। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। শুধু নিজের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল করল, মাথার ওপর কয়েকটা গাঙচিল চক্কর দিয়ে উড়ছে।

কিছু একটা দেখে থমকে দাঁড়াল গডফ্রে। সামনে ওটা কি পড়ে আছে বুঝতে পারল না। সিন্ধুদানব? মাত্র ত্রিশ কদম দূরে, একটা বালির ঢিবির ওপাশে কুঁকড়ে পড়ে আছে। বোধহয় কোন জন্তুই হবে।

সাবধানে এগোল গডফ্রে। বুকের ভেতরটা ঢিপ-ঢিপ করছে। আরে, কি আশ্চর্য! কোথায় জন্তু! এ তো মানুষ! গডফ্রের মুখ থেকে অস্ফুটে দুটো শব্দ বেরুল, 'প্রফেসর টার্টলেট!'

সামুদ্রিক দানব বলে যাকে ভুল করেছিল, সেটা আসলে তার নাচের মাস্টার অধ্যাপক টার্টলেট। ছুটে তাঁর পাশে চলে এল গডফ্রে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, ঈশ্বর, ওঁকে বাঁচিয়ে রাখো!

প্রফেসর টার্টলেট একচুল নড়ছেন না। হাঁটু গেড়ে তাঁর পাশে বসল গডফ্রে। কোমরের লাইফ-বেল্টটা একটু ঢিলে করল, তারপর দু'হাত দিয়ে অধ্যাপকের হাত-পা ডলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেলেন টার্টলেট। শিক্ষকের নাম ধরে ডাকল গডফ্রে, 'স্যার, মি. টার্টলেট?'

বিড়বিড় করে কি যেন বললেন টার্টলেট। তাঁকে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল গডফ্রে।

ধীরে ধীরে চোখ মেললেন টার্টলেট। 'স্যার, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি আপনার ছাত্র–গডফ্রে!'

টার্টলেট কথা না বলে একবার মাথা ঝাঁকালেন। তারপর ধীরে

ধীরে উঠে বসলেন তিনি, চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখছেন। ক্ষীণ হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। সলিল সমাধি ঘটেনি, পায়ের তলায় শক্ত মাটি আছে, এটা বুঝতে পেরেই হাসছেন তিনি। গডফ্রের সাহায্য ছাড়াই, নিজের চেষ্টাতে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। নাচুনে পা জোড়া সচল হলো। পকেট-বেহালার তারে ছড় টানলেন টার্টলেট। বেহালায় বেজে উঠল বিষণ্ন একটা সুর।

ছাত্র ও শিক্ষক পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

'যাক, ঈশ্বর যা করেন ভালই করেন, শেষ পর্যন্ত আমরা তাহলে বন্দরে পৌঁছালাম!' বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছাত্রের মাথার চুল আদর করে এলোমেলো করে দিলেন তিনি।

বন্দর? এই বিপদেও মনে মনে হাসল গডফ্রে। তবে শিক্ষকের মন খারাপ হয়ে যাবে, তাই তাঁর ভুল ধারণাটা ভেঙে দিতে মন চাইল না। বলল, 'লাইফ-বেল্টটা এবার খুলে ফেলুন, স্যার। ওটা কোমরে থাকলে হাঁটাচলায় অসুবিধে হবে। তারপর, বেহালাটা রেখে, চলুন চারপাশটা ঘুরে দেখি।'

'কিন্তু একটা শর্ত আছে,' নেচে উঠে বললেন টার্টলেট। 'পথে প্রথম যে রেস্তোরাঁ চোখে পড়বে, সেটাতেই ঢুকব আমরা। এত খিদে পেয়েছে, মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। ডজনখানেক স্যান্ডউইচ আর দু'এক গ্লাস শ্যাম্পেন এখুনি আমার চাই।'

'বেশ, তাই চলুন, প্রথমে একটা রেস্তোরাঁই খুঁজে বের করি,' হাসি চেপে বলল গডফ্রে।

'এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো তোমার মামাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠানো,' বললেন টার্টলেট। 'রেস্তোরাঁর বেয়ারাকে কিছু বকশিশ দিলেই টেলিগ্রাম অফিসে ছুটবে সে। তার পেলে তোমার মামা নিশ্চয়ই খরচা বাবদ টাকা-পয়সা পাঠাতে ইতস্তত করবেন

না। আমার পকেট তো একবারে ফাঁকা মাঠ হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে। একান্তই যদি এ-দেশে টেলিগ্রাম অফিস না থাকে, বকশিশ দিয়ে কাউকে ডাকঘরে পাঠালেই চলবে, কি বলেন? চলুন, যাওয়া যাক।'

বালির ঢিবিগুলো পেরুল ওরা। গডফ্রের মনে একটা আশা জাগল, জাহাজডুবির পর আরোহীরা এদিকটায় আশ্রয় নিয়ে থাকলে দেখা হয়ে যেতে পারে। পনেরো মিনিট পর উপকূলের সরু খাঁড়িগুলো পেরিয়ে ষাট-সত্তর ফুট উঁচু একটা ঢিবিতে চড়ল ওরা। এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। কোন বাধা না থাকায় পুব দিগন্তে চোখ বুলানো সম্ভব হলো। উত্তর দিকটা অন্তরীপের মত ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, ওপাশে আরও কোন অন্তরীপ থাকলেও থাকতে পারে, তবে দেখা যাচ্ছে না। একটা ঝর্ণা দেখল ওরা, দক্ষিণ দিক থেকে নেমে এসেছে সৈকতে। এই ডাঙা হয়তো একটা উপদ্বীপ, সেক্ষেত্রে সংলগ্ন জমিন থাকতে পারে শুধু উত্তর বা উত্তর-পুবে। এদিকে প্রচুর গাছপালা, ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে পানির ক্ষীণ ধারা। ঘাসও আছে। তারপর গভীর বনভূমি আর পাহাড়। তবে কোন বাড়ি-ঘর বা মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। মানুষের হাতে তৈরি, এমন একটা জিনিসও ওদের চোখে পড়ছে না। এই জায়গা তাহলে কি? এখানে কি আদৌ কোনকালে মানুষের পা পড়েছে?

'কি হে, গডফ্রে? এ আমরা কোথায় এসে পড়লাম?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন টার্টলেট। 'এদিকে তো আমি কোন শহর দেখতে পাচ্ছি না!'

'নেই, তাই দেখতে পাচ্ছেন না।'

'শহর না থাক, গ্রাম তো থাকবে? তাই বা কই?'

'তাও নেই।'

'তাহলে? এখন আমরা কি করব?' হতাশায় প্রায় মুষড়ে পড়লেন টার্টলেট।

'কি আর করব! আসুন, একজোড়া রবিনসন ক্রুসো বনে যাই।'

'একজোড়া রবিনসন ক্রুসো হয়ে যাব?' বলেই ছাগল ছানার মত তিড়িং করে একটা লাফ দিলেন টার্টলেট। 'আমি? ক্রুসো?' ক্রুসোর অ্যাডভেঞ্চারের কথা স্মরণ করে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন তিনি। ওরকম বিপদে তিনি পড়তে চান না। 'না, গডফ্রে, ভুলেও তুমি এ-ধরনের ঠাট্টা করবে না আর!'

'ঠিক আছে, করব না। কিন্তু শুধু গল্প করলে কি চলবে? আসুন, কাজ শুরু করি। প্রথম কাজ, মাথাগোঁজার একটা ঠাঁই খোঁজা।'

হ্যাঁ, অন্তত রাতের জন্যে নিরাপদ একটা আশ্রয় দরকার ওদের। তারপর খিদে মেটাবার জন্যে চাই খাবার। শুরু হলো খোঁজাখুঁজি। কিছুক্ষণ পর টার্টলেট বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, চোখে অন্ধকার দেখছি আমি। এখানে কোন মানুষজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমার সন্দেহ, জন্তু-জানোয়ারও নেই।'

সৈকতে অবশ্য বেশ কিছু পাখি দেখা যাচ্ছে—গাংচিল, শঙ্খচিল, বালিহাঁস, বুনোহাঁস ইত্যাদি। গডফ্রে ভাবছে, পাখি যখন আছে, তখন পাখির বাসাও পাওয়া যাবে। পাখির বাসায় পাওয়া যাবে ডিম। একটু খুঁজতেই পাথরের খাঁজে-ভাঁজে বাসাগুলো দেখতে পেল ওরা। ছোট জলাশয়গুলোর কিনারায় সারস আর তিতির পাখিও দেখা গেল কয়েকটা। গডফ্রে ভাবছে, বন্দুক থাকলে পাখি শিকার করেও খাওয়া যেত। না, যেত না। পাখির মাংস খেতে হলে সেদ্ধ করতে হবে। আগুন কোথায় যে সেদ্ধ করবে?

না, ডিম খোঁজাই ভাল। আর ডিম খুঁজতে গিয়েই পেয়ে গেল ওরা অপ্রত্যাশিত উপহার। সৈকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে দশবারোটা মুরগি, সঙ্গে দু'তিনটে মোরগ। ওদেরকে দেখেই কঁকর-কঁক করে অভিনন্দন জানাল। কাছেই, ঘাসের ওপর চরতে দেখা গেল পাঁচ-সাতটা ভেড়া আর ছাগলকে। মোরগ-মুরগি আর চারপেয়ে প্রাণীগুলো নিশ্চয়ই ওদের জাহাজ স্বপ্ন-র সম্পত্তি। জাহাজডুবির সময় সাঁতরে এখানে উঠেছে। মনে মনে ভারি খুশি হলো গডফ্রে। এখানে দীর্ঘ দিন থাকতে হতে পারে, সেক্ষেত্রে অবলা প্রাণীগুলোর জন্যে ঘর তৈরি করতে হবে। বেশি কষ্ট করতে হলো না, বালিহাঁসের একগাদা ডিম সংগ্রহ করল ওরা। টার্টলেট প্রশ্ন করলেন, 'ডিম কি কাঁচাই খেতে হবে?'

আগুনটাই এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। কার পকেটে কি আছে দেখল ওরা। টার্টলেটের পকেট থেকে তেমন কিছু বেরুল না, শুধু বেহালার জন্যে খানিকটা তার আর রজন। গডফ্রের পকেট থেকে পাওয়া গেল চামড়ায় মোড়া ছুরি, তাতে ফলা ছাড়াও একটা হুক আছে, আছে দাঁতসহ খুদে করাত আর কর্ক-স্ক্রু। জিনিসটা অনেক কাজেই লাগবে। কিন্তু আগুন জ্বালার কি ব্যবস্থা করা যায়?

শুকনো ডাল ঘষে আগুন জ্বালার চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কোন লাভ হলো না। অগত্যা বাধ্য হয়েই কাঁচা ডিম খেতে হলো। তারপর ওরা বেরুল আশ্রয়ের খোঁজে। টার্টলেট বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন, সম্ভবত অভিশাপ দিচ্ছেন ভাগ্যকে।

বনভূমি থেকে একটু তফাতে বিশাল কয়েকটা গাছ পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, গডফ্রের মনে হলো ওগুলোর কোটরেও আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। কিন্তু অনেক খুঁজেও সেরকম কিছু পাওয়া গেল না। সময় বসে নেই, দিনকে পিছন ফেলে রাত নেমে

আসছে। আশ্রয়ের খোঁজে হাঁটাহাঁটি করায় আবার খিদে পেয়ে গেছে ওদের। উপায় নেই, আবার সেই কাঁচা ডিমই গলা দিয়ে নামাতে হলো। ওই গাছগুলোর নিচেই কাত হলো ওরা। অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল মোরগের ডাকে। গডফ্রে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল কোথায় রয়েছে সে। কিন্তু টার্টলেট বারবার চোখ রগড়ে বোকার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। জাহাজডুবির কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হলো।

'আজকের ব্রেকফাস্টও কি কালরাতের ডিনারের মত জঘন্য হবে?' জিজ্ঞেস করলেন টার্টলেট।

'হ্যাঁ, কাঁচা ডিম খাওয়া ছাড়া উপায় নেই,' বলল গডফ্রে। 'তবে আশা করছি সন্ধে নাগাদ অবস্থার কিছু উন্নতি হবে।'

'আমি নাচ ভুলে যাচ্ছি,' অভিযোগের সুরে বললেন টার্টলেট। 'ঘুম ভাঙা মাত্র চীনামাটির কাপ ভর্তি সোনালি চা আর মোটাতাজা স্যান্ডউইচ খেতে পাচ্ছিলাম, তোমার মামা আমাকে ভাঙা একটা জাহাজে তুলে নির্বাসনে পাঠালেন।'

গডফ্রে বেশ ভালই বুঝতে পারছে, যা করার তাকে একাই করতে হবে, নৃত্যশিক্ষক কোন সাহায্যে আসবেন না। টার্টলেট মনে করিয়ে দেয়ায় কোল্ডেরূপের সঙ্গে ফিনার কথাও ভাবল সে। ওরা কি খবর পাবেন যে জাহাজটা ডুবে গেছে? মন থেকে এ-সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে পাখির ডিম বের করল সে, বলল, 'হাতের কাছে যা পাচ্ছেন আপাতত তাই খেয়ে প্রাণ বাঁচান, স্যার। কিছু না খাওয়ার চেয়ে এই বা মন্দ কি?'

মুখ হাঁড়ি করে টার্টলেট বললেন, 'আমার পেট খারাপ করলে তোমার মামা দায়ী থাকবেন।'

গডফ্রে ভাবছে, আশ্রয়ের সন্ধানে আবার ওদেরকে বেরুতে হবে। আর জানার চেষ্টা করতে হবে এই ডাঙাটা প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোনখানে। সৈকতের আরেকদিকে লোকজন থাকতে পারে, থাকলে এখান থেকে ফেরার কোন একটা ব্যবস্থা ঠিকই করা যাবে। পুরো সৈকতটা ভাল করে দেখা দরকার। হয়তো একটা বন্দরই পেয়ে যাবে ওরা। সেক্ষেত্রে জাহাজে চড়েই ফিরতে পারবে। আর একান্ত যদি এই ডাঙায় কোন জাহাজ না থাকে, চলন্ত কোন জাহাজকে থামানোর চেষ্টাও করা যেতে পারে।

টিলার প্রথম সারিটা পার হয়ে দ্বিতীয় সারির মাথায় চড়ার সিদ্ধান্ত নিল গডফ্রে, ওখান থেকে আশা করা যায় পুরো সৈকতটা দেখা যাবে। দ্বিতীয় সারির কাছে পৌঁছাতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগবে বলে মনে হয় না। মোরগদের সুখী পরিবারটি ঘাসের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভেড়া আর ছাগলগুলো বনের ভেতর ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে আসছে, যেন খুব মজার একটা খেলা পেয়েছে তারা।

'এই মোরগ-মুরগি আর ছাগল-ভেড়াগুলো এখন আমাদের অমূল্য সম্পদ,' টার্টলেটকে বলল গডফ্রে। 'আমি চলে গেলে আপনি এগুলোকে পাহারা দিয়ে রাখতে পারবেন তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলেন টার্টলেট। তবে কাতরকণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কিন্তু তুমি যদি পথ হারিয়ে ফেলো, গডফ্রে?'

'আমি ঠিকই ফিরতে পারব, শুধু আপনি এই জায়গা ছেড়ে না নড়লেই হয়।'

'তোমার মামাকে টেলিগ্রাম পাঠাতে ভুলো না, কেমন? এ-ও বলবে যে আমাদের হাত একেবারে খালি!'

'টেলিগ্রাম বা চিঠি, দুটোই সমান,' বলল গডফ্রে। শিক্ষকের ভুলটা এখনও সে ভাঙতে চাইছে না।

করমর্দন করে টার্টলেটের কাছ থেকে বিদায় নিল সে। জঙ্গলে ঢোকার পর দেখল, গাছপালাগুলো এমন গায়ে গায়ে লেগে আছে যে নিচে এতটুকু রোদ নামতে পারছে না। মাটিতে জীব-জন্তুর পায়ের দাগ আছে, তবে হাঁটাহাঁটির ফলে তৈরি পায়ে চলা কোন পথ নেই। ক্ষিপ্রগতিতে কি সব পাশ কাটিয়ে গেল তাকে। গডফ্রে আন্দাজ করল, হরিণই হবে। ভাগ্য ভাল যে হিংস্র কোন জানোয়ার এখনও দেখা যাচ্ছে না। গাছপালার ডালে ডালে কলোনি তৈরি করেছে অসংখ্য পাখি। বন-মোরগ, বুনো পায়রা, ঘুঘু, চেনা প্রায় সব পাখিই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ-সব পাখি এমন কোন বিশেষ জাতের নয় যে দেখে জায়গাটার অক্ষাংশ আন্দাজ করা যাবে। গাছপালাও কোন সাহায্য করছে না। এ-ধরনের গাছ নিউ মেক্সিকো ও ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়–মেপল, বার্চ, ওক, ম্যাগনোলিয়া, জলপাই, চেস্টনাট। সবই নাতিশীতোষ্ণ এলাকার গাছ। এক জায়গায় জঙ্গল একটু ফাঁকা লাগল, নিচে রোদ নামতে পারছে। গাছের তলা দিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটছে গডফ্রে। অচেনা জায়গা, সাবধানে চলাফেরা করা উচিত, এই কথাটা সে একবারও ভাবল না।

গডফ্রে মনে মনে একটা হিসাব করল। সতেরো দিন সাগর পাড়ি দেয়ার পর স্বপ্ন ডুবে গেছে। সতেরো দিন চীন বা জাপানের কাছাকাছি পৌঁছে যাবার কথা। সূর্য যেহেতু সব সময় দক্ষিণ দিকেই ছিল, কাজেই এটা তো পরিষ্কারই যে ওরা বিষুবরেখা পেরোয়নি।

ঘুরপথে আসতে হলো বলে দু'ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ মাইল পেরুতে পারল গডফ্রে। জঙ্গল ফাঁকা হয়ে এল, সামনে উঁচু টিলার সারি। ঢাল বেয়ে একটা টিলার মাথায় উঠছে সে। ওপর থেকে কি কোন শহর দেখা যাবে? একটা গ্রাম দেখতে পেলেও খুশি হয় গডফ্রে।

কিন্তু যদি খাঁ খাঁ মরুভূমি দেখতে পায়?

ঢাল বেয়ে উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছে। ব্যথায় টন টন করছে পা দুটো। ক্লান্তিতে শরীর যখন আর চলতে চাইছে না, চূড়ায় উঠে এল গডফ্রে।

কি দেখবে সে?

সামনে দিগন্ত পর্যন্ত অথৈ জলরাশি, শুধুই সাগর। দূরে সাগর আর আকাশ এক হয়ে মিশে আছে। ঘুরে চারপাশে তাকাল গডফ্রে। উত্তর-দক্ষিণ-পুব-পশ্চিম ডুবে আছে পানিতে। সীমাহীন সাগরের মাঝখানে এটা ছোট্ট একটা ডাঙা! তারমানে ওরা একটা দ্বীপে এসে উঠেছে!

মনটা হতাশায় ভরে উঠল। সাগরের মাঝখানের এই দ্বীপ থেকে ওরা উদ্ধার পাবে কিভাবে? আবার সে ভাল করে চারদিকে তাকাল। উত্তর-দক্ষিণে বিশ মাইল হবে দ্বীপটা, পুব-পশ্চিমে খুব বেশি হলে বারো মাইল। জঙ্গলটা দ্বীপের ঠিক মাঝখানে বাকিটুকু ঘাসজমি, পাথুরে সৈকত। দ্বীপের এখানে সেখানে বয়ে চলেছে ঝরনার বেশ কয়েকটা ধারা।

এই দ্বীপটার নাম কি? চারপাশের এই যে সাগর, এটার পরিচয়ই বা কে তাকে বলে দেবে? আবার একটা হিসাব শুরু করল গডফ্রে। সতেরো দিনে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো আশি মাইল পাড়ি দিতে পারত স্বপ্ন, এই হিসাবে অন্তত পঞ্চাশ ডিগ্রী তো ওরা পার হয়েছেই। অথচ তারপরও বিষুবরেখা অতিক্রম করেনি। তাহলে ধরে নিতে হয় দ্বীপটার অবস্থান একশো ষাট থেকে একশো সত্তর ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার মধ্যে।

দ্বীপটার নাম জানা নেই তো কি হয়েছে! গডফ্রে নিজেই একটা নাম দিল–ফিনা আইল্যান্ড। ফিনার নামে দ্বীপটার নাম রেখে খুব আশাবাদী হয়ে উঠল সে। দেখা যাক, নামটা ওদের

জন্যে সৌভাগ্য বয়ে আনে কিনা।

টিলার মাথা থেকে কোন বসতি দেখা যাচ্ছে না। তবে দ্বীপের সবটুকু এখান থেকে দেখতেও পাচ্ছে না গডফ্রে। এখুনি না হোক, এক সময় চারদিকটা ঘুরে দেখতে হবে তাকে। এখন টার্টলেটের কাছে ফিরে যাওয়াই উচিত। অনেকক্ষণ হলো একা আছেন তিনি।

টিলা থেকে নামার আগে চারদিকটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিচ্ছে গডফ্রে। সাগর একেবারে খালি, যেন এদিক দিয়ে কখনও কোন জাহাজ আসা-যাওয়া করে না। দ্বীপের উত্তর দিকে তাকাল সে। বিশাল আকারের কয়েকটা গাছ তার দৃষ্টি কেড়ে নিল। গাছগুলো গায়ে গায়ে লেগে আছে। এরকম লম্বা গাছ আগে কখনও দেখেনি সে। গাছগুলোর ফাঁকে একটা ঝরনা আছে বলেও মনে হলো, দূর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কাল ওই জায়গাটা দেখে আসতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল গডফ্রে। ওখানে হয়তো একটা আশ্রয় মিলতে পারে।

এবার দক্ষিণ দিকে তাকাল গডফ্রে। ওদিকটায় সৈকত একটু হলদেটে। পাথরগুলো অদ্ভুত আকৃতির। তারপর ঘাসজমি আর জঙ্গল। হঠাৎ চমকে উঠল গডফ্রে। ওদিকে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে কিসের? কয়েকটা উঁচু পাথরের আড়াল থেকে উঠছে কালো ধোঁয়াটা। আশায় ও উত্তেজনায় দম বন্ধ হয়ে এল তার। তারমানে কি ওদের জাহাজের আরও কেউ আশ্রয় নিয়েছে এই দ্বীপে? কিন্তু না, তা কি করে হয়! মাত্র একদিনে দ্বীপের অতটা ভেতরে কারও পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাহলে ওদিকে কি জেলেদের গ্রাম আছে? জেলে, না আদিবাসি জংলী?

তারপর আর ধোঁয়াটা দেখা গেল না। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। গডফ্রে ভাবল, সে কি তাহলে ভুল দেখল? দৃষ্টিভ্রম?

হতাশ হয়ে ঢাল বেয়ে টিলা থেকে নেমে এল সে। ক্লান্ত পায়ে

জঙ্গল পেরিয়ে ফিরে এল টার্টলেটের কাছে।

এতক্ষণ দু'টুকরো শুকনো কাঠ ঠুকে আগুন জ্বালার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন টার্টলেট। গডফ্রেকে দেখেই তিনি চিৎকার করে জানতে চাইলেন, 'টেলিগ্রাম পাঠিয়েছ তো?'

'টেলিগ্রাম অফিস এখনও খোলেনি,' বলল গডফ্রে।

'কিন্তু ডাকঘর?'

'সে-ও বন্ধ। ও-সব কথা থাক, আসুন আগে কিছু মুখে দিই। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার।'

'আবার সেই কাঁচা ডিম?' টার্টলেট প্রায় কেঁদে ফেললেন।

কোথায় গিয়েছিল, কি দেখে এল, বারবার এ-সব প্রশ্ন করায় বাধ্য হয়েই টার্টলেটকে কথাটা বলল গডফ্রে।

'কি? এটা একটা দ্বীপ?' শুনেই আঁতকে উঠলেন টার্টলেট।

'হ্যাঁ, আমি দ্বীপটার নাম রেখেছি ফিনা আইল্যান্ড।'

'নামটা আমার পছন্দ হলো না,' গডফ্রের মুখের ওপর বলে দিলেন টার্টলেট। 'মিস ফিনার সঙ্গে এটার মিল কোথায়? তার চারপাশে পানি নেই, শুধু ডাঙা। আর এই দ্বীপটার চারপাশে ডাঙা নেই, শুধুই পানি।'

পরদিন সকালে আশ্রয়ের সন্ধানে বেরুল গডফ্রে। এবার তার সঙ্গে টার্টলেটও যাচ্ছেন। ওদের পোষা প্রাণীগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। আজ সকালে শুধু ডিম নয়, একটা ছাগলকে ধরে খানিকটা করে দুধও খাওয়া হয়েছে, মন-মেজাজ তাই দু'জনেরই বেশ ভাল।

সৈকত ধরে এগোলেও, সামনে মাঝে মধ্যে ঢিবি আর পাথর পড়ল। সাবধানে সেগুলো টপকে এল ওরা। সবার আগে রয়েছে গডফ্রে, ছোট্ট বাহিনীর সেই তো লীডার। গডফ্রের পিছনে রয়েছে

পোষা প্রাণীগুলো। ওগুলোকে খেদিয়ে আনছেন টার্টলেট। কাজটা করতে গিয়ে নৃত্যচর্চাও হয়ে যাচ্ছে তাঁর। শরীরটাকে বাঁকিয়ে কখনও তিনি মুরগির পিছনে ছুটছেন, কখনও ভেড়ার পিছনে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল গডফ্রে। কয়েকটা গাছের ডালে কিছু ফল ঝুলছে। দেখেই চিনতে পারল, ক্যালিফোর্নিয়ায় রেড-ইন্ডিয়ানরা এই ফল খুব শখ করে খায়। 'আমাদের মেন্যুতে নতুন একটা আইটেম যোগ হলো। পাখির ডিম, ছাগলের দুধ, আর এখন থেকে এই ফল—ম্যানজানিলা।'

'এই ফল মানুষ খায়?' জিজ্ঞেস করলেন টার্টলেট।

কয়েকটা ফল পাড়ল গডফ্রে। টার্টলেটকে বলল, 'খেয়ে দেখুন না, অমৃত মনে হবে।'

ফলে একটা কামড় দিলেন টার্টলেট। মাথা ঝাঁকিয়ে তারিফ করলেন। ম্যানজানিলা আসলে বুনো আপেল. সামান্য একটু টক, তবে খেতে খারাপ লাগে না।

খানিকপর বালির ঢিবিগুলোকে পিছনে ফেলে এল ওরা। ঘাসজমির ওপর এদিকে বেশ কিছু গাছপালা আছে, আর আছে একটা চঞ্চলা ঝরনা। আরও কয়েকশো গজ এগোতে সেই প্রকাণ্ড আকারের গাছগুলোর দেখা পাওয়া গেল, কাল যেগুলো টিলার মাথা থেকে দেখেছিল গডফ্রে। ইতিমধ্যে প্রায় চার ঘণ্টা হাঁটা হয়েছে, দূরত্ব পেরিয়েছে নয় মাইলের কম নয়। সময়টা এখন বিকেল।

ম্যানজানিলা ঝোপের গা ঘেঁষে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড গাছগুলো। গাছের তলায় নরম ঘাস, তবে ছোটখাট কিছু পাথর ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তারই মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ঝরনা। কাছেই সৈকত।

বিশাল গাছগুলো আসলে দেবদারু। সবচেয়ে বড় গাছটার

গুঁড়িতে চার কি পাঁচ ফুট চওড়া একটা ফোকর দেখতে পেল গডফ্রে। প্রায় দশ ফুট উঁচু সেটা। রীতিমত একটা গুহার মতই লাগছে, ভেতরে ঢুকতে কোন অসুবিধে নেই। 'যাকে বলে একেবারে রেডিমেড বাড়ি। আসুন, মি. টার্টলেট, ভেতরে ঢুকে দেখা যাক।'

ফোকরের ভেতর এক গাদা শুকনো পাতা আর শ্যাওলা জমে আছে। মেঝের পরিধি বিশ ফুটের কম হবে না। অন্ধকার তো, তাই ঠিকমত বোঝা গেল না ছাদটা কত উঁচুতে। গাছের ছাল ভেদ করে ভেতরে রোদ ঢুকতে পারে না। ঠাণ্ডা বাতাস বা বৃষ্টির ছাঁটও ঠেকিয়ে রাখে। গডফ্রে টার্টলেটকে বলল, 'এখন থেকে এটাই আমাদের আস্তানা, কি বলেন, স্যার?'

চেহারায় নাখোশ একটা ভাব, টার্টলেট প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'কিন্তু চিমনি নেই কেন?'

'চিমনি তো দরকার আগুন জ্বালার পর। আসুন, চেষ্টা করে দেখি আগুন জ্বালা যায় কিনা।'

গাছের ফোকর থেকে বেরিয়ে চারপাশে একটা চক্কর দিচ্ছে গডফ্রে। মার্টল ঝোপ, ম্যানজানিলা ঝোপ পেরিয়ে একটা ঢালের কাছে চলে এল সে। এদিকে ওক, বীচ, সিকামোর আর কাঁটাঝোপ ভর্তি। সামনে আরও গাছপালা দেখা যাচ্ছে। গডফ্রে ঠিক করল, ওদিকটা কাল দেখে আসবে। এ পর্যন্ত যতটুকু দেখল, বেশ সন্তুষ্টই বোধ করল সে। তার চেয়ে বেশি খুশি দেখা গেল পোষা প্রাণীগুলোকে। প্রচুর ঝোপ আর ঘাস থাকায় খাদ্যের কোন অভাব হবে না ওদের। এরই মধ্যে মুরগির দলটা পোকামাকড় ধরে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

রাতে ওরা পাখির ডিম, ছাগলের দুধ আর বুনো আপেল বেশ মজা করেই খেলো। শোয়ার আগে প্রকৃতিদত্ত আস্তানা অর্থাৎ

প্রকাণ্ড দেবদারু গাছটার নামকরণ করল গডফ্রে–উইল-ট্রি মামার নাম উইলিয়াম ডব্লিউ কোল্ডেরূপ, উইলিয়ামের অংশবিশেষ উইল। তার এই নামকরণে টার্টলেট কোন মন্তব্য করলেন না, তবে তাঁর খুব একটা আপত্তি আছে বলেও মনে হলো না।

জাহাজডুবির পর গডফ্রে অনেকটাই বদলে গেছে। চঞ্চল, আরামপ্রিয়, অলস গডফ্রেকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিপদ যতই কঠিন হোক, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে শিখেছে সে। বুদ্ধিরও যেন ডালপালা গজাতে শুরু করেছে। এখন আর তার অভিধানে হতাশা বলে কোন শব্দ নেই। নিজের ওপর নির্ভর করতে শিখেছে, শিখেছে সহজাত উদ্ভাবনী শক্তিগুলোকে কাজে লাগাতে। নিজের ভেতর যে এত গুণ ছিল, জাহাজটা না ডুবলে তার অজানাই থেকে যেত। নিজেকে সে চিনতেই পারত না।

গডফ্রে প্রতিজ্ঞা করেছে, যত কঠিন বিপদেই পড়ুক, কোনমতে হার মানবে না সে।

সকাল হলো। আজ উনত্রিশে জুন। কাজের একটা তালিকা তৈরি করল গডফ্রে। প্রতিটি দেবদারু গাছ ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে নতুন কোন ফল পাওয়া যায় কিনা। টার্টলেট ঘুমাচ্ছেন, তাঁকে না জাগিয়েই ফোকরটা থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

হালকা কুয়াশায় সাগর আর সৈকত ঢাকা পড়ে আছে। উত্তর আর পুব দিকই শুধু খানিকটা পরিষ্কার। একটা গাছ থেকে ডাল ভেঙে ছড়ি বানাল গডফ্রে, তারপর সৈকত ধরে হাঁটা ধরল। যেতে যেতেই নাস্তা সেরে নিল সে। ঝিনুক, পাখির ডিম আর বুনো আপেল। ঝরনাটার ডান তীর ধরে সৈকতের দক্ষিণ-পুব দিকে যাচ্ছে। দূর থেকে এদিকটায় কিছু ঝোপ-ঝাড় দেখেছিল কাল।

দেড়-দু'মাইল পেরিয়ে এল গডফ্রে। এদিকে ছোট একটা নদী

দেখা যাচ্ছে। হরেক রকম হাঁস আর পাখি খেলা করছে পানিতে। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে কয়েকটা গাংচিল। পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে গোটা এলাকা মুখর। একজোড়া মাছরাঙা ছোঁ দিল পানিতে, দুটো মাছ নিয়ে উড়ে গেল আরেক দিকে। নদীর দিকে মনোযোগ দিল গডফ্রে। স্বচ্ছ পানি, সেখানে রঙবেরঙের মাছ সাঁতরে বেড়াচ্ছে। বাহ্, ওরা তাহলে মাছ ধরেও খেতে পারবে!

আবার সেই আগুনের কথাটা ভাবতে হলো। নদীর কিনারা ধরে আরও সামনে এগোচ্ছে গডফ্রে। হঠাৎ তার বিস্ময়ের সীমা থাকল না। এদিকে ছোট একটা খেত রয়েছে, খেতে ফলেছে এক ধরনের যব। কিন্তু যব তো আর এমনি খাওয়া যাবে না, রান্না করতে হবে। আবার সেই আগুনের কথা মনে পড়ল। একটু পর আরও একটা জিনিস দেখে খুশি হয়ে উঠল গডফ্রে। জিনিসটা এক ধরনের ফল, নাম না জানা। তবে গডফ্রে এই ফল রেড-ইন্ডিয়ানদের খেতে দেখেছে। নিজেও একটা খেলো। বেশ সুস্বাদু। নিশ্চয়ই পুষ্টিকরও হবে।

উইল-ট্রির কাছে ফিরে এসে গডফ্রে দেখল টার্টলেট নাস্তা সারছেন। তাকে দেখেই চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন। কি কি আবিষ্কার করেছে, সব খুলে বলল গডফ্রে। 'কিন্তু আগুন?' জিজ্ঞেস করলেন টার্টলেট। 'আগুন ছাড়া তুমি রাঁধবে কিভাবে?'

'হ্যাঁ, আগুন জ্বালার একটা ব্যবস্থা না করলেই নয় আর,' চিন্তিত সুরে বলল গডফ্রে।

'এই খাওয়াদাওয়ার সিস্টেমটা না থাকলে কি হত?' মুখ বেজার করে বললেন টার্টলেট। 'ঈশ্বর ইচ্ছা করলে খিদে জিনিসটা না দিলেও পারতেন, তাই না?'

'একটা সময় আসবে যখন না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারবে

মানুষ,' বলল গডফ্রে।

'নাহ্, তা কি করে হয়!'

'হয়। চেষ্টা করলে সব হয়। আমাদের বিজ্ঞানীরা তো শুনছি এই বিষয়টা নিয়ে রাতদিন গবেষণা করছেন।'

'তোমার বা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না,' বললে টার্টলেট। 'খাদ্য না দিয়ে জীব-জন্তুকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'আসুন প্রকৃত সত্য আর যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা বিবেচনা করি,' বলল গডফ্রে। 'আমরা যা খাই তার খানিকটা হজম হয়, বাকিটা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। যেটুকু হজম হয় তা থেকে শরীরের তাপের চাহিদা মেটে। এখন ধরা যাক, রসায়নবিদরা এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করল যা খেতে হয় না, নাক দিয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি শরীরে, এবং তা থেকে আমরা পুষ্টি এবং অন্যান্য দরকারী জিনিস সবই পাব, তাহলে রোজ তিন বেলা খেতে বসার ঝামেলা থেকে রেহাই না পাবার কি কারণ আছে? ঘ্রাণে অর্ধভোজন বলে একটা কথা এখনই চালু, তখন বাস্তবে দেখা যাবে ঘ্রাণে পূর্ণভোজন হয়ে যাচ্ছে।'

ফোঁস করে একটা বিশাল নিঃশ্বাস ছাড়লেন টার্টলেট। 'আহা, এমন চমৎকার একটা আবিষ্কার আগে কেন সম্ভব হলো না! তাহলে নাক দিয়ে বাতাস টেনেই ডজনখানেক স্যান্ডউইচ আর কড়া ঝাল দেয়া কাবাব খেয়ে নিতাম।'

'আসুন আমরা কাজে মন দিই,' স্বপ্নচারী টার্টলেটকে তাগাদা দিল গডফ্রে। উইল-ট্রির ফোকরটাকে ওরা আস্তানা হিসেবে গ্রহণ করেছে ঠিকই, কিন্তু সেটাকে বাসযোগ্য করতে হলে খাটাখাটনি করতে হবে। টার্টলেটের জন্যে অপেক্ষায় না থেকে কাজে লেগে গেল গডফ্রে। প্রথমে মেঝেটা পরিষ্কার করল সে, ঝেঁটিয়ে বিদায়

করল শুকনো পাতা আর শ্যাওলার স্তূপ। মেঝেটা আসলে শিকড়ের সমষ্টি, খানিকটা উঁচু-নিচু আর শক্ত। ফোকরের দুই কোণে শোয়ার ব্যবস্থা হবে। বিছানা হিসেবে নরম পাতা ফেলা হলো। গডফ্রে জানাল, ফার্নিচারও দরকার, সে-সব নিজেদেরকেই তৈরি করে নিতে হবে। বেঞ্চ, টুল, টেবিল বানাতে কাঠ লাগবে, জঙ্গলে তা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সঙ্গে ছুরি-কাঁটা থাকায় ওগুলো তৈরি করতে কোন অসুবিধে হবে না।

ফোকর বা কোটর কতটা উঁচু, একটা বারো ফুট লম্বা ডাল দিয়ে মাপতে চেষ্টা করল গডফ্রে। কিন্তু ডালটা কোথাও ঠেকল না, অর্থাৎ ছাদের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না।

সূর্য অস্ত গেল। ওদের কাজ এখনও শেষ হয়নি। ক্লান্ত শরীর আর কতই বা সয়! খানিক বিশ্রাম নিয়ে খেতে বসল ওরা। তারপর আরও খানিক বিশ্রাম দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল থেকেই আস্তানা গোছগাছ করতে ব্যস্ত থাকল ওরা। দিনটা যে কিভাবে কেটে গেল, দু'জনের কেউই বলতে পারবে না। আজ ওরা যে যার পরনের কাপড়চোপড় ধুলো ঝরনার পানিতে।

জুলাইয়ের তিন তারিখ পর্যন্ত দিনগুলো শুকনো থাকল, একবারও ঝড়-বৃষ্টি হলো না। ইতিমধ্যে নতুন বাড়িটাকে রীতিমত ভালবেসে ফেলেছে ওরা। গাছের গায়ে বড় একটা গর্ত, সেটাকেই দু'জন মিলে আরামদায়ক বাসস্থানে পরিণত করেছে। মন্টোগোমারি স্ট্রীটে গডফ্রের মামার যে প্রাসাদ আছে, আরাম-আয়েশের বিচারে সেটার চেয়ে কোন অংশে কম যায় না এটা, কাজেই সেই প্রাসাদের খুদে সংস্করণই বলতে হবে এটাকে।

যতই আরামে বসবাস করুক, অচেনা এই দ্বীপ থেকে দেশে ফেরার জন্যে মনটা সব সময় ব্যাকুল হয়ে থাকে গডফ্রের। ফিনা

তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, এই চিন্তাটা কোনভাবেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না সে। তাই রোজ একবার সৈকতে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, আশা সাগরে যদি কোন জাহাজকে দেখা যায়। কিন্তু ফেনা, ঢেউ আর স্রোত ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। গডফ্রে অবশেষে ধরে নিল, প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটায় কোন জাহাজ চলাচল করে না। ফিনা আইল্যান্ড সম্ভবত সমস্ত জলপথ থেকে অনেক অনেক দূরে। তবু, ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখে গডফ্রে। তার ধারণা, ভুল করে হলেও কোন জাহাজ এদিকে আসবে, ওরা সেই জাহাজ চড়ে দেশে ফিরে যাবার সুযোগ পাবে। ঈশ্বর দুর্বলকে সাহায্য করেন, এটা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে সে।

অবসর সময়ে প্রায় রোজই আগুনের কথাটা ওঠে। আর আগুনের কথা উঠলেই টার্টলেট প্রায় হুমকি দেয়ার সুরেই ছাত্রকে বলেন, 'চোখের সামনে এমন নধর সব মোরগ-মুরগি, মোটাতাজা ছাগল-ভেড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ ও-সব বাদ দিয়ে খেতে হচ্ছে কাঁচা ডিম, কাঁচা দুধ, আর কাঁচা ফল। গডফ্রে, এ আর আমি সহ্য করতে রাজি নই।'

মনমরা হয়ে চুপ করে থাকে গডফ্রে।

টার্টলেট কিন্তু থামেন না। 'এ-সব কাঁচা জিনিস খেয়ে আমার পেট খেপে যাচ্ছে, গডফ্রে! সত্যি বলছি, পেট সরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে। তুমি যদি শিগ্‌গির আগুন জ্বালতে না পারো,' ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছেন তিনি, 'পেটটাকে আমি সামলাতে পারব না! মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয় চোখ গরম করে ছাগলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি, তাতে যদি ওগুলোর গায়ে আগুন ধরে যায়!'

তারপর একদিন গডফ্রে একটা চকমকি পাথর কুড়িয়ে পেল। ছুরির ফলাটা ইস্পাতের তৈরি, তাতে চকমকি ঠুকে আগুন

জ্বালবার চেষ্টা করল সে। ফুলকি ঠিকই ওঠে, কিন্তু সেগুলোর আয়ু এত কম যে শুকনো ঘাস পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই নিভে যায়।

না, আগুন জ্বালার কোন উপায়ই করা যাচ্ছে না।

অবশেষে প্রকৃতিই আবার ওদেরকে সাহায্য করল। এক রাতে আকাশ ঢাকা পড়ে গেল কালো মেঘে। তারপর বেশ বড় একটা ঝড় উঠল। বজ্রপাতের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি। আকাশের অবস্থা দেখার জন্যে আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এল গডফ্রে। বেরুতেই আবার বজ্রপাত হলো। অকস্মাৎ আকাশ ছোঁয়া দেবদারু গাছের মগডালগুলো দপ করে জ্বলে উঠল। গোটা দ্বীপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার আলোয়।

জ্বলন্ত ডালপালা নিচে খসে পড়ছে। মাথায় পড়বে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল গডফ্রে। পরমুহূর্তে চিৎকার করে উঠল, 'আগুন! আগুন!'

টার্টলেট কোটর থেকে সাড়া দিলেন, 'ঈশ্বরকে হাজারো ধন্যবাদ!'

গডফ্রের দেখাদেখি তিনিও জ্বলন্ত একটা ডাল কুড়িয়ে নিলেন। সেই জ্বলন্ত মশালের সাহায্যে আস্তানার ভেতর স্তূপ করে রাখা শুকনো কাঠ আর পাতায় আগুন ধরাল ওরা। গডফ্রে বলল, 'আশ্চর্য কি জানেন, স্যার? পাশের গাছটায় বাজ পড়েছে, অথচ উইল-ট্রির কোন ক্ষতি হয়নি!'

'ঈশ্বরকে আরেকবার ধন্যবাদ।' অনেক দিন পর আজ নাচতে শুরু করলেন টার্টলেট।

একটু পরই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি।

সাত

ছাত্র ও শিক্ষক প্রতিজ্ঞা করল, প্রকৃতির দান হিসেবে আগুন যখন পাওয়া গেছে, এটাকে কোনভাবেই নিভতে দেয়া যাবে না। কিন্তু কাঠ আর শুকনো পাতা যতক্ষণ যোগান দেয়া যাবে ততক্ষণই জ্বলবে ওটা, তারপর নিভে যাবে। সারা রাত জেগে কি এই কাজ করা সম্ভব? টার্টলেট বললেন, 'অবশ্যই সম্ভব। তুমি ঘুমাও, আমি আগুনটাকে জিইয়ে রাখব।' শুধু যে মুখে বললেন তা নয়, কাজটা করেও দেখালেন। আগুনের শিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলেন তিনি। একা নন, গডফ্রেও তাঁর সঙ্গে জেগে থাকল। টার্টলেট মনের আনন্দে অনেক কথাই বলে গেলেন, তার মধ্যে দু'একটা কথা রীতিমত হাসির বোমা। এই যেমন একবার তিনি আগুনের শিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলে উঠলেন, 'গডফ্রে, ওরা দেখছি আমার চেয়েও ভাল নাচে!'

'আপনার চেয়ে ভাল নাচে? কারা?' গডফ্রে অবাক।

'দেখছ না কেমন কোমর দোলাচ্ছে, ঠ্যাং বাঁকাচ্ছে, হাত নাড়ছে, মাঝে মধ্যে তড়াক করে লাফও দিচ্ছে। ভাল করে লক্ষ করো, গডফ্রে। দেখে শেখো। ওরাই তোমার উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারে।'

'আপনি কাদের কথা বলছেন?' গডফ্রে হতভম্ব। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আগুনের শিখা, গডফ্রে! আগুনের শিখা! এত সুন্দর নাচ আমি আগে কখনও দেখিনি!'

হেসে উঠে আগুনটার আরও কাছে সরে এল গডফ্রে, গা গরম করার ইচ্ছে। তবে গা গরম করার চেয়েও জরুরী কাজে আগুনটাকে ব্যবহার করল ওরা। সকাল হতেই রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল দু'জন।

ডিম সেদ্ধ করা হলো। খেতে গিয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেললেন টার্টলেট। 'শুধু ডিমে কিন্তু আমার রসনা তৃপ্তি হবে না। দু'চারটে মুরগি রোস্ট করার ব্যবস্থা করো, গডফ্রে। ভেড়ার একটা ঠ্যাংও চাই। আর চাই ছাগলের সের পাঁচেক মাংস। তুমি বললে কয়েকটা পাখি আর কিছু মাছও ধরে আনি।'

'রয়েসয়ে, স্যার, রয়েসয়ে,' সাবধান করে দিয়ে বলল গডফ্রে। 'একসঙ্গে এত সব খেতে শুরু করলে পেট খারাপ করবে যে! তাছাড়া, গোগ্রাসে সব সাবাড় করে ফেললে, ভবিষ্যতে কি হবে? একজোড়া মুরগিই আপাতত যথেষ্ট বলে মনে করি, স্যার। মুরগির মাংসের সঙ্গে যব দিয়ে তৈরি রুটি দারুণ লাগবে।'

এই প্রস্তাবে রাজি হলেন টার্টলেট, ফলে একজোড়া মুরগি প্রাণ হারাল। টার্টলেট আগুনে মুরগি ঝলসাচ্ছেন, ওদিকে গডফ্রে যব থেকে আটা তৈরি করতে ব্যস্ত। সকালের নাস্তাটা আজ ওরা খুব আয়েশ করে খেলো।

সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকল ওরা। সবচেয়ে জরুরী কাজ যে আগুনটাকে টিকিয়ে রাখা, ওরা তা জানে। তাতে প্রচুর কাঠ এনে ফেলা হলো। রাতের বেলা আগুনের পাশে, তবে নিরাপদ দূরত্বে ঘুমাল ওরা।

শেষ রাতের দিকে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল গডফ্রের। ঠাণ্ডা বাতাসের রহস্যটা কি? কোত্থেকে আসছে? খেয়াল

করার পর সে আন্দাজ করল, বাতাস আসছে ফোকরের ওপর দিক থেকে। উইল-ট্রির ডালপালা যেখানে শুরু হয়েছে, নিশ্চয়ই সেখানে আরও একটা ফোকর আছে। কে জানে, পুরো গাছটাই হয়তো ফাঁপা। সমস্যা হলো, মাথার ওপর ফুটো বা গর্ত থাকলে শুধু বাতাস ঢুকবে না, বৃষ্টিও পড়বে। এ কেমন আস্তানা যে বৃষ্টির সময় ভিজতে হবে? গডফ্রে ঠিক করল, ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে হবে। সত্যি যদি গর্ত থাকে, সেটা বন্ধ করা দরকার।

ব্যাপারটা নিয়ে যতই চিন্তা করল সে ততই রহস্যময় লাগল। গত কয়েকদিন এই ঠাণ্ডা বাতাস কোথায় ছিল? তাহলে কি সেদিন যে বাজটা পড়েছিল, এই গাছেও তা আঘাত হানে?

মনটা খুঁত খুঁত করছে গডফ্রের। আস্তানা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সে। গাছের ওপর দিকে তাকিয়ে রহস্যটা কি বোঝার চেষ্টা করছে। একটু পরই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। হ্যাঁ, বজ্রপাতের চিহ্ন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মগডাল থেকে কাণ্ড পর্যন্ত একেবারে ঝলসে দিয়েছে। কাণ্ডের খানিকটা বাকলও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গর্তটাও তৈরি হয়েছে ওখানে। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথাটা নত হয়ে এল গডফ্রের। বাজটা যদি গাছের ভেতর ঢুকে পড়ত, সেই দুর্যোগের রাতে ওরা কেউ বাঁচত না।

বাকল পুড়ে যাওয়ায় ওখানে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, আর সেই গর্ত দিয়ে গাছের ভেতর বাতাস ঢুকছে। তারমানে কি পুরো গাছটাই ফাঁপা? নিশ্চয়ই তাই। এত বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে শুধু বাকলের ওপর ভর করে! নিজের ধারণা সঠিক কিনা পরীক্ষা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল গডফ্রে।

পাইনের ডাল দিয়ে লম্বা একটা মশাল বানাল সে। কোটরের ভেতর ঢুকে মশালটা জ্বালল। লালচে আলোয় ভেসে গেল ভেতরটা। মেঝে থেকে প্রায় পনেরো ফুট ওপরে এবড়োখেবড়ো

একটা ছাদ দেখা যাচ্ছে। মশালটা আরও খানিক উঁচু করতে ছাদের গায়ে গর্তটাও এবার আবছামত দেখতে পেল সে। হ্যাঁ, তার ধারণাই ঠিক। গাছটা আগাগোড়া খালি, পুরোপুরি ফাঁপা।

গাছের ভেতরের দেয়ালগুলোয় অনেক খাঁজ আর ভাঁজ আছে। সেগুলোয় পা রেখে ওপরে ওঠা সম্ভব। ছাদের গর্তটা ভাল করে পরীক্ষা করার জন্যে সাবধানে উঠতে শুরু করল গডফ্রে। গর্ত যখন একটা আছে, সেটাকে বন্ধও তো করতে হবে। ভয় শুধু ঠাণ্ডা বাতাস আর বৃষ্টিকে নয়, ভয় জংলীদেরকেও। আদিবাসিরা যদি হঠাৎ হামলা করে বসে, ওই গর্ত ওদের পালাবার পথ হতে পারে। গডফ্রে এখন তাই ভাবছে, গর্তটা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া উচিত হবে না।

একজোড়া শিকড়ের মাঝখানে মশালটাকে আটকে রেখে ওপরে উঠছে গডফ্রে। তিন মিনিটের মধ্যে প্রায় ষাট ফুট উঠে এসেছে সে। কী সাংঘাতিক, গাছটা সত্যি আকাশছোঁয়া! একটানা উঠতে পারছে না সে, খানিকটা উঠে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। গর্তটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। আর বিশ-পঁচিশ ফুট দূরে।

ঠাণ্ডা বাতাস এখন রীতিমত গডফ্রের মুখে ঝাপটা মারছে। যত ওপরে উঠছে সে, গাছের ভেতরটা ততই ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। এক সময় গর্ত থেকে মাথাটা বাইরে বের করে দিল গডফ্রে। তার মুখের চারপাশে এখন ঘন পাতায় ঢাকা মগডালই শুধু দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, গাছটার আশপাশ থেকে মুখ তুলে ওপর দিকে কেউ তাকালে তাকে কেউ দেখতে পাবে না। অথচ গডফ্রে দ্বীপের চারদিক অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে, হঠাৎ একদিকে মোচড় খেয়ে ওঠা ধোঁয়া দেখে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল গডফ্রে।

কোন ঝোপ-ঝাড় থেকে নয়, ধোঁয়া উঠছে সৈকত থেকে।

ওদিকে কোন গাছপালা নেই, কাজেই আগুনটা বাজ পড়ার ফলে সৃষ্টি হয়নি। তা যদি হতও, বৃষ্টি হওয়ায় নিভে যাবার কথা। রহস্যটা কি তাহলে?

তরতর করে নিচে নেমে এল গডফ্রে। গাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে হন হন করে সৈকতের দিকে যাচ্ছে সে। ধোঁয়া মানেই আগুন, সেই আগুনের রহস্য তাকে জানতেই হবে। এর আগেও ধোঁয়া দেখেছে সে, কিন্তু রহস্যটার কোন কিনারা আজও করতে পারেনি। আজ সে গোটা ব্যাপারটা ভালভাবে তদন্ত করে দেখতে চায়।

কিন্তু সৈকত চষে ফেলেও কোন লাভ হলো না। ধোঁয়া বা আগুন, কিছুই নেই কোথাও। আশপাশে কোন লোকজন আছে কিনা বোঝার জন্যে চিৎকার শুরু করল সে, গলা চড়িয়ে ডাকছে, 'কেউ কি আছ? কোন ভয় নেই, সাড়া দাও!' কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

ব্যাপারটা চোখের ভুল বলে মানতে পারছে না গডফ্রে। তার মনে প্রশ্ন জাগল, তবে কি উষ্ণ কোন প্রস্রবণ আছে সৈকতের আশপাশে? পাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়াটা কি সেই প্রস্রবণ থেকে উঠেছে? কিন্তু তা যদি থাকেই, চোখে পড়ছে না কেন?

প্রায় চার ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে উইল-ট্রির কাছে ফিরে এল গডফ্রে। ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙেছে প্রফেসর টার্টলেটের। পকেট বেহালায় সুর তুলছেন, মাঝে মধ্যে উসকে দিচ্ছেন আগুনটা।

বিছানার শুকনো ঘাস আর পাতা কয়েকদিন পরপরই বদলে ফেলছে গডফ্রে। আরামে বাস করতে হলে পরিশ্রম না করলে চলে না। ছুরি দিয়ে মোটা একটা শিকড় চেঁছে কোটরের ঠিক মাঝখানে

একটা টেবিল বানিয়েছে সে। বাইরে থেকে গাছের গুঁড়ি নিয়ে এসে তৈরি করেছে টুল। সেগুলোকে আরামকেদারা হয়তো বলা যাবে না, তবে বসার কাজ ভালভাবেই চলে। ঝড়-বৃষ্টির দিনে এখন ওদেরকে হাঁটুর ওপর খাবার রেখে খেতে হবে না, টেবিলে বসে খেতে পারবে।

ঠাণ্ডার দিনে কি পরবে, এই নিয়ে বেশ চিন্তায় আছে গডফ্রে। এখন সময়টা গরমকাল, অর্ধনগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু শীতকালের জন্যে গরম কাপড় চাই। প্যান্ট, শার্ট আর ওয়েস্টকোট এখনও পরা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যেভাবে ছিঁড়ে যাচ্ছে তাতে আর বেশিদিন পরা যাবে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো গাছের ছাল আর ছাগল-ভেড়ার চামড়াই পরতে হবে ওদেরকে।

টার্টলেট ঘোষণা করেছেন, গডফ্রে হলো এই দ্বীপের প্রধানমন্ত্রী। খাদ্যদফতরটা প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতেই রেখেছেন। রোজ সকালে সুস্বাদু শেকড় আর ফল সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ে গডফ্রে। এই কাজে কয়েক ঘণ্টা করে বেরিয়ে যায় তার। মাঝে মধ্যে মাছ ধরতেও যায় সে। মাছ বা মাংসের কোন অভাব নেই, কিন্তু হাঁড়ি-পাতিল না থাকায় রান্না করাটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগুনে ঝলসানো মাছ-মাংস খেতে কতদিন আর ভাল লাগে।

ভেতরে কোটর আছে, এরকম আরও একটা দেবদারু গাছ আবিষ্কার করেছে গডফ্রে। অবশ্য ওদের আস্তানার মত অত বড় নয় সেটা। দ্বিতীয় গাছটার ভেতর মোরগ-মুরগিরা থাকছে। মুরগিগুলো ওখানেই ডিম পাড়ে। ইতিমধ্যে অনেক বাচ্চাও ফুটেছে।

ভেড়া আর ছাগলের জন্যেও একটা আস্তানা দরকার। তবে শীত আসতে এখনও বেশ দেরি আছে, কাজেই গডফ্রের কোন

তাড়া নেই। ওগুলোর শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালই যাচ্ছে, দ্বীপে আসার পর আগের চেয়ে মোটাতাজা হয়েছে সবগুলো। ইতিমধ্যে বংশবিস্তারও মন্দ হয়নি।

সব মিলিয়ে অনেকগুলো প্রাণী, সবাই বেশ সুখেই আছে। ফিনা আইল্যান্ডে এখন পর্যন্ত কোন হিংস্র জন্তুর দেখা পাওয়া যায়নি। থাকলে অবশ্যই ছাগল-ভেড়ার ঘাড় মটকাবার জন্যে হানা দিত।

দিনগুলো বেশ শান্তই কাটছে ওদের। জুন মাসের ছাব্বিশ তারিখে হঠাৎ একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে দ্বীপের উত্তরপ্রান্তে চলে এল গডফ্রে। এদিকে আগে কখনও আসেনি সে। সৈকতের কিনারায় একটা বালির ঢিবি দেখতে পেল সে, পানি থেকে খুব কাছে। ঢিবিটার কাছে সামুদ্রিক আগাছার একটা স্তূপ রয়েছে। স্তূপটার পাশে অদ্ভুত আকৃতির একটা পাথর পড়ে আছে। যেন একটা আজব জন্তু গুঁড়ি মেরে বসে আছে, পাহারা দিচ্ছে সাগরকে।

পাথরটা কি মন্ত্র জানে? তা না হলে গডফ্রেকে এভাবে টানছে কেন? কাছে এসে গডফ্রে হতভম্ব হয়ে পড়ল। কোথায় পাথর, এটা তো দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড একটা সিন্দুক!

এত বড়, এত ভারী একটা সিন্দুক এখানে এল কিভাবে? এটা কি ওদের জাহাজের সম্পত্তি, জাহাজডুবির পর স্রোতের টানে সৈকতে উঠে এসেছে? নাকি অন্য কোন জাহাজ ডুবেছে এদিকটায়, এটা সেই জাহাজের সম্পত্তি?

সিন্দুক যারই হোক, এটা যে ওদেরকে ঈশ্বর দান করেছেন তাতে আর সন্দেহ কি। এই দ্বীপে ওরা ছাড়া আর যখন কেউ নেই, এটা ওদেরই প্রাপ্য। এখন দেখা দরকার সিন্দুকের ভেতর কি আছে।

প্রথমে সিন্দুকটা ভালভাবে পরীক্ষা করল গডফ্রে। নাম-ঠিকানা কিছুই লেখা নেই গায়ে ঢাকনিটা অত্যন্ত শক্তভাবে বসানো হয়েছে, খুলতে সমস্যা হবে। লোহার নয়, কাঠের তৈরি সিন্দুক, কিনারাগুলো তামার পাত দিয়ে মোড়া।

সৈকত থেকে ওদের আস্তানা চার মাইল দূরে, এত ভারী একটা জিনিস সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঢাকনি খোলার আগে তালা খুলতে হবে, তাই সেটাকেই আগে পরীক্ষা করল গডফ্রে। কোন যন্ত্রপাতি নেই, অগত্যা বড় একটা পাথর তুলে তালার গায়ে বাড়ি মারতে শুরু করল সে।

তালা ভেঙে গেল। ঢাকনি খুলে গডফ্রে দেখল, সিন্দুকের ভেতরটা দস্তার পাত দিয়ে মোড়া। ভেতরে এতটুকু পানি ঢুকতে পারেনি। দস্তার পাত সরাতেই গডফ্রের চোখ জোড়া আনন্দে চকচক করে উঠল। এটা যে কোন সংসারী লোকের সিন্দুক তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা সংসার করতে যা যা লাগে সব এতে আছে। জিনিসগুলো এলোমেলো না করে কি কি আছে দেখে নিচ্ছে গডফ্রে। মুখে মুখে তালিকা তৈরি করছে সে—প্যান্ট-শার্ট, টেবিল-ক্লথ, চাদর, জানালার পর্দা, পশমী গেঞ্জি, পশমী মোজা, সুতি মোজা, মখমলের ড্রেসিং গাউন, হাতে বোনা ওয়েস্টকোট; লোহার কড়াই, কেটলি, কফির পাত্র, চায়ের জন্যে আলাদা কেটলি, ছুরি, কাঁটা-চামচ; আয়না, চিরুনি; কয়েক পাত্র ব্র্যান্ডি, কয়েক পাউন্ড করে ভাল চা ও কফি; যন্ত্রপাতির মধ্যে পাওয়া গেল করাত, তুরপুন, পেরেক, আঙটা, শাবল, কুড়ুল, কোদাল ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়। বেশ কিছু অস্ত্রও আছে—চামড়ার খাপে মোড়া একজোড়া বিশাল ভোজালি, একটা দোনলা ও একটা একনলা বন্দুক, তিনটে রিভলভার, বারো পাউন্ড কার্ট্রিজ ও গুলি, কয়েকশো বুলেট। সব অস্ত্রই একটা ব্রিটিশ কোম্পানির তৈরি। সিন্দুকের

ভেতর দিকে পাওয়া গেল ওষুধের ছোট একটা বাক্স, একটা দূরবীন, একটা কম্পাস, একটা ক্রনোমিটার। এক কোণে রয়েছে ইংরেজিতে লেখা কয়েকটা বই, কয়েক দিস্তা কাগজ, কলম, পেন্সিল, একটা পঞ্জিকা, নিউ ইয়র্কে ছাপা একটা বাইবেল ও একটা রান্না শেখার সচিত্র বই।

আশ্চর্য ব্যাপার! ঠিক যা যা ওদের দরকার, সিন্দুকটায় শুধু সে-সব জিনিসই রয়েছে। একেই বলে ভাগ্য। ফিনা আইল্যান্ডে এখন আর ওদের কোন জিনিসেরই অভাব থাকবে না।

সব জিনিস এখুনি আস্তানায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অস্ত্র ও অন্যান্য দু'একটা জিনিস নিয়ে প্রফেসর টার্টলেটের কাছে ফিরে এল গডফ্রে। তার হাতে লোহার কড়াইটা দেখে টার্টলেট এমন নাচ শুরু করলেন, থামাতে ঘেমে উঠল গডফ্রে। সব কথা শোনার পর গডফ্রেকে মাথায় তুলে আরেক দফা নাচলেন তিনি। এতদিন তিনি তাঁর পকেট-বেহালায় শুধু করুণ সুর বাজিয়েছিলেন আজ এই প্রথম ছড় টেনে তুললেন আনন্দ আর উল্লাসের সুর।

দুপুরের খাওয়া কোনমতে সেরে গডফ্রে আবার রওনা হলো, এবার তার সঙ্গে টার্টলেটও রয়েছেন। সৈকতে এসে সিন্দুকটা দেখলেন তিনি। ঢাকনি খুলে থরে থরে সাজানো জিনিসগুলোর ওপর পরম মমতায় হাত বুলালেন।

দু'জন মিলে যতটা পারা যায় সিন্দুকের জিনিস-পত্র আস্তানায় বয়ে নিয়ে এল ওরা। যাবার আগে কড়াইয়ে স্টু চাপিয়ে গিয়েছিল, সেটা খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল।

পরদিন আবার ভোর হতেই ছুটল সৈকতে। আরও তিনবার আসা-যাওয়া করে বাকি জিনিস-পত্র আনতে হলো। আগস্টের এক তারিখে খালি সিন্দুকটাও দু'জন ধরাধরি করে নিয়ে এল সেই থেকে সিন্দুকটাকে ওরা ওয়ার্ড্রোব হিসেবে ব্যবহার করছে।

সিন্দুকের ভেতর এতসব জিনিস-পত্র পেয়ে গডফ্রের চেয়েও বেশি খুশি মনে হলো প্রফেসর টার্টলেটকে। উচ্ছ্বাস আর আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে বারবার তিনি বলছেন, 'ফিনা আইল্যান্ডে আমাদের ভবিষ্যৎ দেখা যাচ্ছে খুবই উজ্জ্বল।'

সেদিন সন্ধের দিকে ছাত্রের সামনে দাঁড়ালেন তিনি, হাতে পকেট-বেহালা। 'গডফ্রে, আবার তোমার নাচ শেখাটা শুরু করা দরকার। এসো, আজ তোমাকে একটা নতুন নাচ শেখাই।'

আট

ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভেবে প্রফেসর টার্টলেট যতই আত্মতৃপ্তি বোধ করুন, গডফ্রের মনে কিন্তু শান্তি নেই। ফিনা আইল্যান্ডে চিরকাল তাদেরকে থেকে যেতে হবে, এটা ভাবলেই তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। সাগরের বুকে এই দ্বীপ একটা ফাঁদ, সেই ফাঁদ থেকে যেভাবেই হোক পালাতে হবে তাকে।

সিন্দুকটা পাওয়ায় ওদের কাজ অনেক কমে গেছে। টার্টলেটের কাজ অবশ্য বেড়েছে, কারণ প্রায় সারাদিনই নানারকম রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকেন তিনি। বন্দুক পাওয়ায় পোষা প্রাণীগুলোকে আর মারতে হয় না, হরিণ আর পাখি শিকার করে আনে গডফ্রে। উইল-ট্রির দেয়ালে গজাল ও পেরেক দিয়ে বেশ কয়েকটা তাক বানিয়েছে সে, তৈজস-পত্র সব ওই তাকের ওপরই রেখেছে ওরা। অন্যান্য জিনিস-পত্রও রাখা হয়েছে

দেয়ালের গায়ে খোপ তৈরি করে। যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রগুলো রাখা হয় আঙটার সঙ্গে দেয়ালের গায়ে।

কোটরের মুখে কাঠের একটা দরজাও লাগিয়েছে গডফ্রে। গাছের দেয়াল কেটে একজোড়া জানালাও তৈরি করা হয়েছে। এবার টার্টলেটের দাবি অনুসারে একটা চিমনিও বানাতে হবে। রান্নার কাজ এখন আস্তানার বাইরে সারছে ওরা, কিন্তু বৃষ্টি-বাদলার দিনে তো ভেতরেই কাজটা করতে হবে, চিমনি না থাকলে তখন ধোঁয়া বেরুবে কিভাবে?

আরও একটা জরুরী কাজ সেরে ফেলেছে গডফ্রে। ডালপালা এক করে বেঁধে ছোট নদীটার ওপর সরু একটা সাঁকো তৈরি করেছে সে। নদীর দুই পারে আসা-যাওয়া করতে এখন আর পানিতে নামতে হয় না ওদেরকে।

সব কাজই করছে গডফ্রে, কিন্তু বাড়ির কথা মনে পড়লেই মনটা তার খুব খারাপ হয়ে যায়। চিন্তা-ভাবনা করে দ্বীপের উত্তর অন্তরীপের মাথায় একটা পতাকা ওড়াবার ব্যবস্থা করল সে। আশপাশ দিয়ে কোন জাহাজ গেলে পতাকাটা অবশ্যই দেখতে পাবে। সাদা পতাকা নাবিকদের চোখে না-ও ধরা পড়তে পারে, তাই উদ্ভিদের রস দিয়ে কাপড়টা লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে সে।

পনেরো আগস্ট পার হয়ে গেল। দু'দু'বার ধোঁয়া দেখেছে গডফ্রে, অথচ ধোঁয়ার উৎস সম্পর্কে আজও কিছু জানতে পারেনি। দ্বীপে ওরা দু'জন ছাড়া অন্য কোন মানুষ আছে, এ-ও বিশ্বাস করা যায় না। থাকলে বন্দুকের আওয়াজ শুনে তারা আসত।

ধোঁয়ার রহস্য গডফ্রেকে বিমূঢ় করে রেখেছে। ফিনা আইল্যান্ডে উষ্ণপ্রস্রবণ থাকার কথা নয়, কারণ এই দ্বীপ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে তৈরি হয়নি। অগত্যা বাধ্য হয়েই গডফ্রেকে মেনে নিতে হলো, দেখতেই ভুল হয়েছে তার, আসলে

সে কোন ধোঁয়া দেখেনি।

দিনগুলো ভালই কেটে যাচ্ছে ওদের। ইদানীং নিয়মিত গডফ্রেকে নাচ শেখাচ্ছেন প্রফেসর টার্টলেট। গডফ্রেও নিয়মিত শিকারে বেরুচ্ছে, দৈনন্দিন কাজগুলো সময় ধরে সারছে।

তারপর হঠাৎ তেরো সেপ্টেম্বরের বেলা তিনটের দিকে ধোঁয়ার লম্বা একটা রেখা দেখতে পেল গডফ্রে। সেদিন ফ্ল্যাগ-পয়েন্ট পর্যন্ত গিয়েছিল সে। ওখানে পতাকা উড়িয়েছে, তাই জায়গাটার নাম রেখেছে ফ্ল্যাগ-পয়েন্ট। চোখে দূরবীন তুলে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ সাগর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখল। বুকটা সঙ্গে সঙ্গে ধক্ করে উঠল তার। 'জাহাজ! একটা জাহাজ!'

ধোঁয়ার রেখাটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। বেলা চারটের দিকে জাহাজটার চিমনি দেখা গেল, কালো একটা বিন্দুর মত। এখনও জাহাজটা অনেক দূরে, দিগন্তের একেবারে কিনারায়।

বেলা পাঁচটার দিকে পুরো জাহাজটা দেখতে পেল গডফ্রে। এখনও অনেক দূরে, তবু জাহাজের গায়ের রঙ চিনতে পারছে সে। এমন কি পতাকার রঙও। পতাকা দেখেই বুঝতে পারল, জাহাজটা যুক্তরাষ্ট্রের।

গডফ্রে ভাবল, আমি ওদের পতাকা দেখতে পাচ্ছি, তাহলে ওরাও নিশ্চয় আমার পতাকাটা দেখতে পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে জাহাজটার তো এদিকেই আসার কথা। কিন্তু তা কি আসছে? হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল গডফ্রে, পতাকাটা নামিয়ে দ্রুত এদিক ওদিক দোলাতে লাগল বাতাসে।

ইতিমধ্যে জাহাজ অনেকটা কাছে চলে এসেছে। সৈকত থেকে এখন ওটার দূরত্ব খুব বেশি হলে তিন মাইল। তাহলে কি নাবিকরা গডফ্রেকে দেখতে পেয়েছে? দেখতে পেলে অবশ্যই সাড়া দেয়ার কথা, কিন্তু তা দিচ্ছে না কেন? নিয়ম হলো, ওরাও

পতাকাটা খানিক নিচু করে দোলাবে। কিন্তু কই!

ধীরে ধীরে সন্ধে হয়ে এল। সাড়ে ছ'টা বাজে। ফিনা আইল্যান্ড থেকে জাহাজটা যখন মাত্র দু'মাইল দূরে, ঝপ করে অস্ত গেল সূর্য। এখনও পতাকাটা দোলাচ্ছে গডফ্রে। কিন্তু বৃথাই!

একটু পর পতাকা রেখে বন্দুকটা তুলে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করল গডফ্রে। কিন্তু গুলির আওয়াজ সম্ভবত জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছাল না–ইতিমধ্যে সেটা অনেক দূরে সরে গেছে, বাতাসও বইছে উল্টোদিকে। রাত ক্রমশ বাড়ল, অন্ধকার ঢেকে দিল সাগরকে। জাহাজটাকে এখন আর দেখাই যাচ্ছে না। কোন সাড়া না দিয়ে ফিনা আইল্যান্ডকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল নাবিকরা। এখন আর গডফ্রের কিছু করার নেই। হাল ছেড়ে না দিয়ে কিছু কাঠ আর শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালল সে। মনে আশা, দেখতে পেলে নাবিকরাও আগুন জ্বেলে সাড়া দেবে।

কিন্তু জাহাজে কোন আগুন জ্বলল না।

বিষণ্ন মনে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল গডফ্রে। দুঃখে প্রফেসর টার্টলেটকে জাহাজটার কথা বললই না সে।

পরদিন বিকেলে রোজকার মত ফ্ল্যাগ-পয়েন্টে ঝিনুক আর পাখির ডিম আনতে গেলেন প্রফেসর টার্টলেট। বেশ কিছুক্ষণ পর গডফ্রে দেখল, ভূতে পাওয়া মানুষের মত ছুটে ফিরে আসছেন তিনি। প্রাণপণে ছুটছেন, ছোটার ভঙ্গিতে কোন ছন্দ নেই, অথচ সিন্দুকটা পাবার পর থেকে টার্টলেটের প্রতিটি নড়াচড়াতে নৃত্যের নিত্যনতুন ভঙ্গি ফুটে ওঠে। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল আতঙ্কে তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে। গডফ্রে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'স্যার, কি হয়েছে?'

'ওদিকে! ওদিকে!' উত্তরের গাছপালার দিকে হাত তুলে

দেখালেন টার্টলেট। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছেন তিনি।

'ওদিকে কি?'

'ক্যানু! একটা ক্যানু!'

'ক্যানু?'

'শুধু ক্যানু?' সবেগে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'শুধু ক্যানু নয়! গডফ্রে, আমরা খুন হয়ে যাব!'

'সে কি! কি বলছেন!' গডফ্রে হতভম্ব।

'ক্যানু ভর্তি জংলী, গডফ্রে! স্রেফ কচুকাটা করবে আমাদের। নিশ্চয়ই ওরা মানুষ খায়।

টার্টলেটের লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাল গডফ্রে। তীর থেকে আধমাইলটাক দূরে ছোট একটা ডিঙি দেখা যাচ্ছে। ফ্ল্যাগ-পয়েন্ট পার হয়ে দ্বীপেই ভিড়বে বলে মনে হচ্ছে। 'কেন বলছেন জংলীরা নরখাদক?' টার্টলেটকে জিজ্ঞেস করল সে।

'সেটার আশঙ্কাই বেশি, তাই।'

'ওটা জংলীদের ডিঙি না-ও হতে পারে,' বলল গডফ্রে। 'হয়তো কোন সওদাগরি জাহাজের নৌকা।'

'সওদাগরি জাহাজের নৌকা?'

'অসম্ভব নয়। কাল বিকেলে ফিনা আইল্যান্ডের পাশ দিয়ে একটা জাহাজ চলে গেছে।'

'জাহাজ চলে গেছে?' প্রফেসর অবাক। 'অথচ আমাকে তুমি কিছুই বলোনি!'

'বলে কি লাভ হত? চলুন, নৌকাটা কোথায় ভেড়ে দেখি।'

আস্তানা থেকে দূরবীনটা নিয়ে এল গডফ্রে। একটু ভাল করে নৌকাটার দিকে তাকাতে আঁতকে উঠল সে। 'আপনার কথাই ঠিক, স্যার! সত্যি জংলীরা আসছে!' গডফ্রে এত ভয় পেয়েছে যে তার হাত থেকে দূরবীনটা পড়ে গেল।

টার্টলেট থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন।

নৌকায় সত্যি জংলীরা আছে। দ্বীপের দিকেই আসছে তারা। নৌকাটা পলিনেশিয়ান ক্যানুর মতই দেখতে, বাঁশ খাড়া করে তাতে বেশ বড় একটা পাল টাঙানো হয়েছে। নৌকার আকার-আকৃতি দেখে গডফ্রে বুঝতে পারছে, মালয়েশিয়া থেকে ওদের ফিনা আইল্যান্ড খুব বেশি দূরে হবে না। কিন্তু ক্যানুতে মালয়ীরা নেই, রয়েছে প্রায় উলঙ্গ দশ-বারোজন লোক। সবাই তারা কালো কুচকুচে। প্রত্যেকের হাতে বৈঠা দেখা যাচ্ছে।

জংলীরা এখন যদি ওদেরকে দেখে ফেলে তাহলেই সর্বনাশ। এখন আর পতাকাটা নামিয়ে ফেলাও সম্ভব নয়। নামাতে গেলেই ওদেরকে তারা দেখে ফেলবে। আবার না নামালেও, এই পতাকা দেখেই অসভ্য লোকগুলো টের পেয়ে যাবে যে দ্বীপে লোকজন আছে।

ঝুঁকে দূরবীনটা আবার তুলে চোখে ঠেকাল গডফ্রে। অন্তরীপকে পাশ কাটিয়ে দ্বীপের ভেতর দিকে ঢুকে পড়ল ক্যানু, যাচ্ছে ছোট নদীটার দিকে। শংকিত হয়ে উঠল গডফ্রে। জংলীরা উইল-ট্রির দিকেই যাচ্ছে।

প্রফেসর টার্টলেটকে নিয়ে উইল-ট্রির দিকে ছুটল গডফ্রে। জংলীরা ওদের আস্তানায় হামলা চালালে যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে।

প্রফেসর টার্টলেট কিন্তু অন্য কথা ভাবছেন। কপালে চাপড় মেরে তিনি বললেন, 'হায়, একেই বলে দুর্ভাগ্য! আসলে কপালের লিখন কে খণ্ডায়! আমাদের শখ হয়েছিল রবিনসন ক্রুসো হব! তো দ্বীপে জংলীদের ক্যানু এসে ভিড়বে না, অথচ রবিনসন ক্রুসো হব, এ তো আর সম্ভব নয়! একদিন না একদিন নরখাদকরা তো আসবেই। মাত্র তিন মাস হলো এই দ্বীপে এসেছি আমরা। মাত্র

তিন মাস! এরইমধ্যে জংলীরা এসে হাজির! এখন তো স্বীকার না করে উপায় নেই যে ড্যানিয়েল ডিফো বা জোহান ওয়েস, কেউই তাদের বর্ণনায় খুব একটা রঙ চড়াননি।'

দেবদারুর নিচে আগুন জ্বলছে, ফিরে এসে প্রথমেই সেটা নিভিয়ে দিল গডফ্রে। আগুন তো নেভালই, কয়লা আর ছাইও সব ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলল। জংলীরা এদিক দিয়ে হেঁটে গেলেও টের পাবে না যে এখানে আগুন জ্বালা হয়েছিল। মোরগ-মুরগিরা আগেই নিজেদের আস্তানায় ঢুকেছে, সেটার মুখ ডালপালা দিয়ে আড়াল করে রাখা হলো। ছাগল আর ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে দেয়া হলো বেশ খানিকটা দূরে। যে-সব জিনিস বাইরে ছিল সেগুলো তুলে আনা হলো উইল-ট্রির ভেতরে। আস্তানায় ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ওরা। এমন কি জানালা দুটোও খোলা রাখল না।

কান পেতে চুপচাপ বসে আছে ওরা। রাতটা যেন কোনমতে শেষ হচ্ছে না। বাইরে নানারকম আওয়াজ হচ্ছে, প্রতিটি শব্দ চমকে দিচ্ছে ওদেরকে। একবার মনে হলো দেবদারু গাছের আশপাশে কারা যেন হাঁটাহাঁটি করছে। জানালার একটা কবাট সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকাল গডফ্রে। কেউ নেই। অন্তত কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

আবার শুরু হলো অপেক্ষার পালা। তারপর এক সময় সত্যি সত্যি পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। জানালার কবাট আবার ফাঁক করে বাইরে তাকাল গডফ্রে। এত উদ্বেগ-আশঙ্কার মধ্যেও হাসি পেল তার। ঘাসজমি থেকে একটা ছাগল একা ফিরে এসেছে। গাছতলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

গডফ্রে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে জংলীরা তাদের আস্তানা দেখে ফেললে কি করবে সে। উইল-ট্রির ভেতর দিকের দেয়ালের

খাঁজে পা দিয়ে তরতর করে উঠে যাবে তারা মগডালে। জংলীদের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে ওই জায়গাটাই আদর্শ। সঙ্গে বন্দুক আর রিভলভার আছে, গুলিরও কোন অভাব নেই, কাজেই যুদ্ধ বাধলে তারাই জিতবে। জংলীদের সঙ্গে খুব বেশি হলে তীর-ধনুক আছে। তাদের তীর গাছের শাখা-প্রশাখায় গিয়ে লাগবে, মগডাল পর্যন্ত পৌঁছাবে না। তাছাড়া, বন্দুক-রিভলভারের সঙ্গে তীর-ধনুকের কি কোন তুলনা চলে?

রাতটা ভয়ে ভয়ে কাটছে। তবে জংলীরা এদিকে এখনও আসেনি। রাতে হয়তো আসবেও না। দিনের আলোয় চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর হয়তো দ্বীপে নামবে।

টার্টলেট বললেন, 'ওরা বোধহয় টের পায়নি যে দ্বীপে মানুষ আছে।'

গডফ্রে মাথা নাড়ল। 'পতাকাটা তো না দেখতে পাবার কথা নয়। কাজেই জানে যে এখানে মানুষ আছে। তবে আমরা ক'জন তা জানে না। সেজন্যেই হয়তো হামলা চালাতে ভয় পাচ্ছে। সকালে কি ঘটবে বলা যায় না।'

'সকালে তারা চলেও যেতে পারে।'

'চলে যাবে বলে মনে হয় না। এত কষ্ট করে ফিনা আইল্যান্ডে তারা এক রাতের জন্যে নিশ্চয়ই আসেনি।' একটু পর গডফ্রে আবার বলল, 'সকালে ওরা যদি না আসে, আমরাই ওদের খোঁজে বেরুব।'

'কী!' আঁতকে উঠলেন টার্টলেট। 'আমরা খুঁজতে বেরুব? কেন?'

'আড়াল থেকে দেখতে হবে সংখ্যায় ওরা ক'জন, ওদের উদ্দেশ্যটাই বা কি,' বলল গডফ্রে। 'আমরা দু'জন কিন্তু সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকব, বিচ্ছিন্ন হব না। যদি মনে হয় ওদের মতলব ভাল

নয়, সেক্ষেত্রে এই আস্তানা ছেড়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দেব আমরা…'

'শ্‌শ্‌শ্‌…চুপ!' ফিসফিস করলেন প্রফেসর টার্টলেট। 'বাইরে শব্দ হলো না?'

জানালার কবাট একটু ফাঁক করে বাইরে তাকাল গডফ্রে। 'না, ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ছাগল-ভেড়াগুলো ফিরে আসছে। মি. টার্টলেট, সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হন। বেশি না, একটা বন্দুক নিন। মনে রাখবেন, যেদিকে বলব শুধু সেদিকেই গুলি করবেন। পারবেন তো?'

'আমাকে বন্দুক ছুঁড়তে হবে?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন প্রফেসর টার্টলেট। 'আমি বন্দুক ছুঁড়তে গেলে বন্দুকই যদি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়? আগে কখনও ছুঁড়িনি কিনা।'

গডফ্রে অভয় দিয়ে বলল,'চেষ্টা করলে পারবেন। আমি দেখিয়ে দেব।'

'কিন্তু আমার গুলি কি জংলীদের গায়ে লাগবে?'

'লাগানোর হয়তো দরকারই হবে না,' বলল গডফ্রে। 'গুলির আওয়াজ শুনেই জংলীরা হয়তো পালাবে।'

ভোরের আলো ফোটার পর জানালা খুলে চারপাশে চোখ বোলাল গডফ্রে। কিন্তু কোন ক্যানু বা জংলী, কিছুই দেখতে পেল না। ওরা খুব অবাক হলো। জংলীরা গেল কোথায়?

চোখে দূরবীন, জানালা দিয়ে ফ্ল্যাগ-পয়েন্টের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গডফ্রে। ওদিকটা একেবারে ফাঁকা, কিছুই নেই। গডফ্রের মন খুঁত খুঁত করছে। কি যেন একটা অবশ্যই থাকার কথা ওদিকে, অথচ নেই। কি সেটা? তারপর হঠাৎ মনে পড়তে আঁতকে উঠল সে। 'সর্বনাশ!'

'কি হলো?' জানতে চাইলেন প্রফেসর টার্টলেট।

পরিস্থিতিটা দ্রুত ব্যাখ্যা করল গডফ্রে। দ্বীপে যে লোক আছে, জংলীরা তা জেনে ফেলেছে। কিভাবে? ফ্ল্যাগ-পয়েন্টে ওদের পতাকাটা নেই।

আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তখুনি তৈরি হলো গডফ্রে। টার্টলেট দ্বিধায় ভুগছেন দেখে বলল, 'তাহলে একা আপনি এখানে থাকুন।'

'একা থাকতে হলে আমি ভয়েই মরে যাব।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন,' তাগাদা দিল গডফ্রে। তারপর আশ্বাস দিয়ে জানাল, বন্দুক আর রিভলভারে গুলি ভরাই আছে, ট্রিগার টিপলেই–'গুড়ুম'! প্রফেসরের হাতে একটা বন্দুক ধরিয়ে দিল সে, নিজেও একটা নিল।

টার্টলেট কোমরে একটা ভোজালি গুঁজলেন। কার্ট্রিজ ভরা একটা পাউচও তাঁর কাছে থাকল। গডফ্রেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেহালাটাও সঙ্গে রাখব কিনা? সুর শুনে জংলীরা হয়তা শত্রুতা ভুলে বন্ধুত্ব করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দেবে...'

গডফ্রে গম্ভীর সুরে বলল, 'না।'

সাবধানে দরজা খুলে বাইরে বেরুল ওরা। ইতিমধ্যে ছ'টা বেজে গেছে। দেবদারু গাছের মাথায় ঝিলিক দিচ্ছে উজ্জ্বল রোদ। চারপাশের পরিবেশ শান্ত, চুপচাপ। ছাগল-ভেড়াগুলো আবার ফিরে গেছে ঘাসজমিতে।

বাইরে থেকে আস্তানার দরজাটা বন্ধ করে দিল গডফ্রে। সেটা এমনভাবেই বানানো হয়েছে যে বন্ধ করার পর দেখে মনেই হয় না যে ওখানে একটা দরজা আছে। আস্তানার সামনে ওদের পায়ের ছাপ মুছে ফেলল ওরা, তারপর জায়গাটায় ছড়িয়ে দিল শুকনো পাতা। নদীর দিকে যাচ্ছে ওরা। সামনে রয়েছে গডফ্রে, পিছনে টার্টলেট। প্রফেসর আজ আবার নাচ ভুলে গেছেন। বন্দুক

কাঁধে থাকায়, হোঁচট খেতে খেতে হাঁটছেন তিনি। আর যাই হোক, হোঁচট খাওয়াকে নাচ বলা যায় না।

নদীর কাছে এসে গাছতলায় দাঁড়াল গডফ্রে। চোখে দূরবীন তুলে ফ্ল্যাগ-পয়েন্টের দিকে তাকাল। নাহ্, দেখার মত কিছুই নেই। কোন মানুষ না, একটু ধোঁয়া না।

পশ্চিম তীরটাও তাই, একদম ফাঁকা।

গডফ্রে সিদ্ধান্ত নিল, কাল রাতে জংলীরা যেখানে নৌকা ভিড়িয়েছিল সেই জায়গাটা এবার দেখে আসতে হয়। অর্থাৎ এখন ওদেরকে নদীর মোহনায় যেতে হবে। নদীর ধারে প্রচুর গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় আছে, গা ঢাকা দিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হবে না। তার সন্দেহ হলো, ক্যানুতেই আছে জংলীরা, বিশ্রাম নিচ্ছে। তা যদি হয়, ভেবে দেখতে হবে ওরাই জংলীদের ওপর হামলা করবে কিনা।

সাবধানে, কোন আওয়াজ না করে, ধীরে ধীরে এগোচ্ছে গডফ্রে। টার্টলেট অবশ্য নিঃশব্দে হাঁটতে পারছেন না। হোঁচট কখনও শব্দহীন হয় না। মনে মনে বিরক্ত বোধ করলেও, হাজার হোক শিক্ষক, গডফ্রে তাই কিছু বলছে না। তবে বিপদের সময় উনি যে কতটুকু সাহায্যে আসবেন, তা সে আন্দাজ করতে পারছে।

এক ঘণ্টায় মাত্র এক মাইল এগোল ওরা। এখন পর্যন্ত বেমানান কিছুই চোখে পড়েনি। এতক্ষণ ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়েছে ওরা, কিন্তু সামনের পথ বেশ অনেকটা ফাঁকা, কোন গাছপালা নেই। আড়াল থেকে না বেরিয়ে নদীর দুই পারের ওপর চোখ বোলাচ্ছে গডফ্রে।

আশ্চর্য, জংলীরা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে! এমন কি হতে পারে যে ওদের মত জংলীরাও লুকিয়ে আছে? আড়াল থেকে লক্ষ

রাখছে ওদের ওপর?

কথাটা শুনে হেসে উঠলেন টার্টলেট। তিনি যে ভয়-ডর কাটিয়ে উঠেছেন, গডফ্রের তা জানা ছিল না, তাই একটু অবাক হলো সে। তবে কিছু বলল না। তার ধারণা, বিপদ এখনও কাটেনি।

ফাঁকা জায়গাটা সাবধানে পার হয়ে এল ওরা। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর সাগরের কিনারায় পৌঁছাল। এদিকে, নদীর পারে, বড় কোন গাছ নেই। আড়াল পেতে চাইলে হামাগুড়ি দিয়ে ছোট কয়েকটা ঝোপের দিকে যেতে হবে ওদেরকে। গডফ্রের দেখাদেখি প্রফেসর টার্টলেটও হামাগুড়ি দিয়ে এগোলেন।

'শুধু শুধু লোক হাসাচ্ছি আমরা,' প্রতিবাদের সুরে বললেন তিনি। 'জংলীরাই যেখানে নেই, সেখানে তাদেরকে ভয় পাবার কি দরকার, শুনি?'

'জংলীরা আছে!' ফিসফিস করল গডফ্রে। 'না থেকে পারে না। আপনি তৈরি থাকুন, আমি বললেই গুলি করবেন।'

সামান্য একটু এগোতেই কয়েকটা বড় পাথরের আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখল ওরা। ঘাসের ওপর শুয়ে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরল গডফ্রে। 'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে, স্যার,' বলল সে। 'এর আগে আরও দু'বার ধোঁয়া দেখেছি আমি। তারমানে কি আগেও দু'বার জংলীরা দ্বীপে নেমেছিল?' নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিল সে। 'কিন্তু না, তাই বা কিভাবে সম্ভব! অনেক খুঁজেও আমি তো কোথাও কোন ছাই বা কয়লা দেখিনি। তবে, আশা করি, এই ধাঁধার এবার একটা সমাধান পাওয়া যাবে।'

হামাগুড়ি দিয়েই নদীর বাঁকে পৌঁছাল ওরা। এখান থেকে নদীর দু'দিকেই অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে। চোখ বুলাতে শুরু করেই চমকে উঠল গডফ্রে। তবে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না।

ইঙ্গিতে প্রফেসর টার্টলেটকে সামনে এগোতে নিষেধ করল সে।

আগুনটা জ্বালা হয়েছে তীরের বড় একটা পাথরের ওপর। বেশ বড় আগুন, প্রচুর কাঠ জড়ো করে ধরানো হয়েছে। শুধু আগুন নয়, ওটাকে ঘিরে জংলীরাও বসে আছে। নদীর তীরে আরেকটা বড় পাথর দেখা যাচ্ছে, নৌকাটাকে সেটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

খালি চোখেই সব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে গডফ্রে। ওদের কাছ থেকে জংলীদের দূরত্ব দুশো গজও হবে না। আগুনে কাঠ পুড়ছে, তার শব্দও শুনতে পাচ্ছে ওরা। মাথাগুলো গুনল গডফ্রে। নিশ্চিত হলো, আপাতত কোন ভয় নেই, জংলীরা সবাই আগুনের কাছেই রয়েছে। দশজন বসে আছে আগুনটাকে ঘিরে, তারা মাঝে মধ্যে কাঠ গুঁজে দিচ্ছে আগুনে। একজন, সেই বোধহয় সর্দার, পায়চারি করছে আর মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দ্বীপের ভেতর দিকটায় তাকাচ্ছে। লোকটাকে গডফ্রের সর্দার মনে হলো কাঁধে লাল কাপড় দেখে। জংলীরা সব মিলিয়ে বারোজন। শেষ লোকটাকে আগুনের কাছেই একটা খুঁটির সঙ্গে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে।

লোকটাকে বেঁধে রাখার মানে কি? সে কি কোন অপরাধ করেছে? গডফ্রে হঠাৎ খুব বিচলিত বোধ করল। আরও একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করছে জংলীরা। কারণটা স্পষ্ট। বারো নম্বর লোকটাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। গডফ্রের মনে পড়ল, প্রফেসর টার্টলেট কাল জংলীগুলোকে মানুষখেকো বলে সন্দেহ করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে তাঁর ধারণাই ঠিক।

রবিনসন ক্রুসোরা সবাই দেখা যাচ্ছে একই রকম–একটা যেন আরেকটার নকল। ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়েছিল ড্যানিয়েল ডিফোর নায়কও। যে খেলার যে নিয়ম, গডফ্রে

উপলব্ধি করল তাদেরও এই লোকটাকে উদ্ধার করতে হবে। ঠিক যেভাবে ক্রুসো জংলীদের হাত থেকে ফ্রাইডেকে উদ্ধার করেছিল।

এ সম্ভব নয়, চোখের সামনে কাউকে পুড়ে মরতে দেয়া যায় না। ওদের সঙ্গে দুটো দোনলা বন্দুক রয়েছে। দুটোতে চারটে বুলেট। একজোড়া রিভলভারে রয়েছে বারোটা বুলেট। এগারোজন অসভ্যকে ঘায়েল করতে যথেষ্ট। খুন করতে হবে না, ফাঁকা আওয়াজ করলেই জংলীগুলো যে যেদিকে পারে ছুটে পালাবে।

একটু পরই পায়চারি থামিয়ে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল সর্দার। বন্দীর হাত দুটো পিছমোড়া করে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, তার দিকে একটা হাত তুলে ইঙ্গিত করল সে। তার এই ইঙ্গিতের অপেক্ষাতেই ছিল জংলীরা।

গডফ্রেও সর্দারের এই ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা করছিল। দেরি না করে সিধে হলো সে। গডফ্রে কি করতে চায় তা বুঝতে না পারলেও, দেখাদেখি প্রফেসর টার্টলেটও দাঁড়িয়ে পড়লেন।

গডফ্রের ধারণা ছিল, তাকে দেখামাত্র ঘাবড়ে যাবে জংলীরা। হয় তারা অস্ত্র উঁচিয়ে ধেয়ে আসবে, তা না হলে ছুটে গিয়ে উঠবে নিজেদের ক্যানুতে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। জংলীরা ওদেরকে গ্রাহ্যই করছে না। ভাবটা যেন, ওদেরকে দেখতেই পায়নি। আবার একটা ইঙ্গিত করল সর্দার। এবার তিনজন জংলী এগিয়ে এসে বন্দীর বাঁধন খুলে ফেলল, তাকে শক্ত করে ধরে আগুনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বন্দী অবশ্য পুড়ে মরতে রাজি নয়। নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করেছে সে। তার ধাক্কা খেয়ে জংলী তিনজন ছিটকে দূরে সরে গেল। কিন্তু আবার তারা ছুটে এসে জাপটে ধরল বন্দীকে। বেচারা একা, ওদের সঙ্গে পারল না। আরও কয়েকজন জংলী ছুটে এসে কাবু করে ফেলল তাকে। সর্দারের হাতে একটা পাথরের কুড়ুল ধরিয়ে দিল এক জংলী।

সেটা মাথার ওপর তুলে বন্দীর দিকে এগোল সর্দার। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সর্দার কি প্রথমে লোকটার মাথা ফাটাবে, তারপর আগুনে পোড়াবে?

গডফ্রে চেঁচিয়ে উঠল। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল তার হাতের বন্দুক। গুলি সম্ভবত মোক্ষম জায়গাতেই লেগেছে, গুড়ুম করে শব্দ হতেই মাটিতে ছিটকে পড়ল সর্দার।

বাকি জংলীরা গুলির আওয়াজ শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। জীবনে বোধহয় এই প্রথম গুলির শব্দ শুনল তারা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই। এবার গডফ্রেকে গ্রাহ্য না করে তাদের উপায় নেই। গডফ্রে ইঙ্গিত করতেই বন্দীকে ছেড়ে দিল তারা।

মুক্তি পেয়ে আর কি দাঁড়ায় বন্দী! গডফ্রেকে লক্ষ্য করে তীরবেগে ছুটছে সে।

আর ঠিক তখনই আরেকটা গুলি হলো—গুড়ুম!

প্রফেসর টার্টলেট চোখ বুজে ট্রিগার টেনে দিয়েছেন। বন্দুকের কুঁদো ধাক্কা মারল তাঁর কাঁধে, পাক খেয়ে চিৎ হলেন তিনি মাটিতে। ব্যথায় গোঙাচ্ছেন।

কিন্তু কী অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ! চোখ বুজে গুলি করলে কি হবে, জংলীদের একজন ছিটকে পড়ল সর্দারের পাশে। সেই সঙ্গে শুরু হলো জংলীদের আতঙ্কিত ছুটোছুটি। নিজেদের দু'জন আহত লোককে নিয়ে ক্যানুতে উঠে পড়ল তারা। ক্যানু ভেসে গেল মাঝ নদীতে।

উল্লাসে ধেই ধেই করে নাচছেন প্রফেসর টার্টলেট। বিজয়ের আনন্দ গডফ্রের চেয়ে তাঁরই বেশি। জীবনের প্রথম গুলিটা শতকরা একশো ভাগ সফল। কাঁধের ব্যথা ভুলে নৃত্য করছেন তিনি।

বন্দী তার উদ্ধারকর্তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর ধীরে

ধীরে নিচু হলো সে, লম্বা হয়ে শুয়ে মাটিতে একটা চুমো খেলো, তারপর মাথাটা রাখল গডফ্রের পায়ের ওপর। কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় তা যেন ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসো' পড়ে জেনে নিয়েছে পলিনেশিয়ান এই জংলীটিও।

নয়

তাড়াতাড়ি ঝুঁকে লোকটাকে টেনে দাঁড় করাল গডফ্রে। বিড়বিড় করে বলল, 'কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে ধন্যবাদ বলাই যথেষ্ট, পায়ে মাথা ঠেকাবার কোন দরকার নেই।' তার কথা জংলী বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল শুধু।

লোকটার বয়স হবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। পরনে শুধুই একটা কৌপীন বা নেংটি। চেহারা-সুরত আর মাথার আকৃতি দেখে গডফ্রের মনে হলো লোকটা পলিনেশিয়ান নয়, সম্ভবত আফ্রিকান। রঙটাও তার কুচকুচে কালো। হয়তো সুদান বা আবিসিনিয়ার লোক। কাফ্রি হবারই বেশি সম্ভাবনা। এ লোক জংলীদের হাতে বন্দী হলো কিভাবে সেটা একটা রহস্যই বটে।

জংলী যখন নয়, ইংরেজি বা অন্য কোন ইউরোপিয় ভাষার দু'চারটে শব্দ হয়তো জানে লোকটা। কিন্তু যখন সে কথা বলল, একটা বর্ণও বুঝতে পারল না ওরা। প্রফেসর টার্টলেট সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, 'লোকটা হয়তো জংলীদের ভাষাতেই কথা

বলছে।'

ইংরেজিতে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল গডফ্রে। বোকার মত চুপ করে তাকিয়ে থাকল কাফ্রি লোকটা, গডফ্রের কথা বুঝতেই পারছে না। গডফ্রে তখন আকার-ইঙ্গিতে তার নাম জানতে চাইল।

লোকটা এবার মুখ খুলল, 'কারেফিনোতু।' এই একটাই শব্দ উচ্চারণ করল সে।

'ওর নাম কারেফিনোতু!' হেসে উঠে বললেন প্রফেসর। 'বড় খটমটে নাম, গডফ্রে। উচ্চারণ করতে কষ্ট হবে। আমি বলি কি, এসো, আমরা ওকে বুধবার বলে ডাকি।'

গডফ্রে প্রতিবাদ জানাল। 'বুধবার একটা নাম হলো নাকি!'

'কিন্তু নামটার তাৎপর্য তুমি অস্বীকার করতে পারো না,' যুক্তি দেখালেন টার্টলেট। 'রবিনসন ক্রুসোর ঐতিহ্য অনুসরণ করলে এই নামটাই রাখতে হয়। ওকে আমরা উদ্ধার করলাম আজ–বুধবারে। ক্রুসো ফ্রাইডেকে পেয়েছিলেন কি বারে? শুক্রবারে। সেজন্যেই তার নাম ফ্রাইডে রাখা হয়েছিল। এখন তুমিই বলো, ওকে কেন আমরা কারেফিনোতু বলে ডাকব?'

'যার যে নাম তাকে সেই নামেই ডাকা উচিত,' বলল গডফ্রে। 'তা না হলে তাকে অপমান করা হয়। ধরুন আপনার জন্ম হয়েছিল সোমবার। এখন কেউ যদি সে-কথা মনে রেখে আপনাকে মানডে বলে ডাকে, আপনার কেমন লাগবে?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে কারেফিনোতুর দিকে তাকাল সে। নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে বলল, 'গডফ্রে।'

কারেফিনোতু অনেকবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনমতেই গডফ্রে শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না। তার চেহারায় হতাশ একটা ভাব ফুটে উঠল। এক সময় হঠাৎ প্রফেসরের দিকে তাকাল সে,

যেন তাঁর নাম জানতে চাইছে।

'আমি টার্টলেট,' মিষ্টি গলায় নিজের নাম বললেন প্রফেসর।

'টার্টলেট!' প্রফেসরের নামটা অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারল কারেফিনোতু।

কারেফিনোতুর সাফল্যে এক দফা নেচে নিলেন টার্টলেট।

গডফ্রে ইঙ্গিতে দ্বীপটা দেখাল, যেন কারেফিনোতুর কাছে এই দ্বীপের নাম জানতে চাইছে। কারেফিনোতু প্রথমে তার প্রশ্নটা ধরতে পারল না। গডফ্রে ইঙ্গিতে দ্বীপের বন-জঙ্গল, ঘাসজমি, নদী, টিলা-পাহাড়, সৈকত ইত্যাদি আবার দেখাল। তার ভাবভঙ্গি অনুকরণ করল কারেফিনোতু। অবশেষে বলল, 'আরনেকা! আরনেকা!'

মাটিতে আঙুল তাক করে গডফ্রে জিজ্ঞেস করল, 'আরনেকা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাফ্রি লোকটা জবাব দিল, 'আরনেকা!'

দ্বীপটার শুধু নাম জেনে গডফ্রের কোন উপকার হলো না। যদি জানতে পারত প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোথায় এই দ্বীপ, তাহলে একটা কাজের কাজ হত। আরনেকা নামটাও হয়তো জংলীদের দেয়া। দ্বীপটার ভৌগোলিক নাম নিশ্চয়ই অন্য কিছু হবে।

কারেফিনোতু পালা করে একবার গডফ্রে আর একবার অস্ত্রগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। তার এই দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল গডফ্রে। কারেফিনোতু বন্দুক আর রিভলভার এই প্রথম দেখছে। অস্ত্রগুলোর দিকে একটু ভয়ে ভয়েই তাকাচ্ছে সে। তার অবশ্য কারণও আছে। সে দেখেছে এগুলো থেকে আগুন ঝরে, শব্দ হয় বজ্রপাতের মত। সেই আগুন আর বজ্রই তো তাকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে!

বন্দুকের যে কি ক্ষমতা, সেটা দেখাবার জন্যে উড়ন্ত একটা

বালিহাঁসকে গুলি করল গডফ্রে। আকাশের অনেকটা ওপরেই ছিল সেটা, কিন্তু গুলির শব্দ হওয়ামাত্র কাতর আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল, গায়ে রক্ত লেগে রয়েছে।

গুলির আওয়াজ শুনে অকস্মাৎ বিরাট একটা লাফ দিল কারেফিনোতু। ভয় পেয়েছে সে, কিন্তু সে ভয় মুহূর্তে কাটিয়ে উঠল যখন দেখল আহত বালিহাঁস ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটছে। সেটাকে ধাওয়া করল কারেফিনোতু। ধরে গডফ্রের কাছে নিয়ে এল, মুখে দু'কান বিস্তৃত হাসি।

হঠাৎ কৃতিত্ব দেখাবার একটা লোভ হলো প্রফেসর টার্টলেটের। ঈশ্বর তাদেরকে বজ্র সৃষ্টি করার ক্ষমতা দিয়েছেন, এটা প্রমাণ করতে পারলে কারেফিনোতুর শ্রদ্ধা অর্জন করা যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ, হাতের বন্দুকটা তুললেন তিনি। নদীর ধারের একটা গাছে বসে আছে নিরীহ মাছ রাঙা, সেটাকে ফেলার জন্যেই লক্ষ্যস্থির করছেন।

গডফ্রে বলে উঠল, 'না, স্যার, গুলি করবেন না!'

টার্টলেট বিস্মিত হলেন। 'কেন?'

'বলা তো যায় না, ধরুন আপনার লক্ষ্য ব্যর্থ হলো, গুলি না লাগায় মাছরাঙাটা উড়ে গেল। তখন কি হবে?'

'কি হবে তখন?'

'ওর কাছে আমরা ছোট হয়ে যাব না?'

'কিন্তু আমার লক্ষ্য ব্যর্থই বা হবে কেন? যুদ্ধটা যখন শুরু হলো, জীবনে প্রথম গুলি করে আমি একজন জংলীকে আহত করিনি?'

'হ্যাঁ, করেছেন। লোকটা তো দড়াম করে পড়েই গেল। তবু আমার অনুরোধটা রাখুন, স্যার। সাবধানের মার নেই। শুধু শুধু ভাগ্যকে খেপিয়ে দেবেন না।'

টার্টলেট খুশি হতে পারলেন না, তবে আর কোন কথা না বলে নামিয়ে নিলেন বন্দুকটা। কারেফিনোতুকে নিয়ে উইল-ট্রির কাছে ফিরে এল ওরা।

দেখা গেল লোকটা শিশুর মত সরল আর অজ্ঞ। যা দেখে তাতেই সে অবাক হয়। ফিনা আইল্যান্ডে ওদের এই মেহমান সবচেয়ে বেশি অবাক হলো দেবদারু গাছের ভেতরে ওদের রাজকীয় বাসস্থান দেখে। গাছটাকে ঘিরে বার কয়েক চক্কর দিল সে, ভেতরে ঢুকে চারদিকে চোখ বোলাল, দরজাটা বারবার খুলল আর বন্ধ করল, ওপর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোটরটার ছাদ বলে কিছু আছে কিনা।

তারপর ওদের সমস্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিস-পত্রের দিকে আঙুল তুলে বিচিত্র শব্দ করতে লাগল সে। অর্থাৎ জানতে চাইছে এগুলো কি, কি কাজে ব্যবহার করা হয়। গডফ্রে তাকে প্রতিটি জিনিসের ব্যবহার পদ্ধতি দেখিয়ে দিল। টার্টলেট বললেন, 'আমাদের সম্মানীয় মেহমান সভ্য মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করেনি।'

তাঁর সঙ্গে একমত হলো গডফ্রে। কারণ দেখা গেল কারেফিনোতু এমন কি আগুনের ব্যবহারও ঠিকমত জানে না। গনগনে আগুনের ওপর লোহার কড়াই চাপানো হয়েছে, অথচ সেটায় আগুন ধরছে না, এটা দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার চোখ। তারপর আয়নায় নিজের চেহারা দেখে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো তার। সংবিৎ ফিরতে আয়নার পিছনে উঁকি দিল, দেখে নিল সেখানে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা।

তার কাণ্ড দেখে টার্টলেট আবার মন্তব্য করলেন, 'এ ঠিক মানুষ নয়। বন মানুষ।'

'স্যার, আপনার ধারণা ভুল,' প্রতিবাদ করল গডফ্রে। 'বন মানুষের বুদ্ধি থাকে না। আয়নার পিছনে উঁকি মারায় প্রমাণ হলো,

কারেফিনোতুর মাথায় বুদ্ধি আছে। ও সব কিছু যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে।'

'ঠিক আছে, মানলাম, লোকটা বনমানুষ নয়,' গডফ্রের কথা মেনে নিয়ে বললেন টার্টলেট। 'কিন্তু ও কি আমাদের কোন কাজে আসবে?'

'অনেক কাজেই আসবে, স্যার,' জোর দিয়ে বলল গডফ্রে।

কি কাজে আসতে পারে তার একটা নমুনা একটু পরই পাওয়া গেল। তার সামনে প্লেট ভর্তি নাস্তা ধরা হলো। এই একটা জিনিস দেখে মোটেও সে অবাক হলো না। প্লেটের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ওটা যেন পালিয়ে যাবে বা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে প্রায় চোখের পলকে প্লেট খালি করে ফেলল সে। বোঝা গেল খিদেতে তার পেটে আগুন জ্বলছিল।

'এত দ্রুত খায়!' অসন্তোষ প্রকাশ করলেন টার্টলেট। তারপর বললেন, 'ওর খাবার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগল না, গডফ্রে। সাবধান, হে, সাবধান! চোখ-কান খোলা রেখো। আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'কি সন্দেহ হচ্ছে?' প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল গডফ্রে।

'সন্দেহ হচ্ছে, লোকটা সম্ভবত মানুষখেকো।'

হাসি পেল গডফ্রের। রসিকতা করে বলল, 'সে অভ্যাস যদি থেকেই থাকে, এখন ওকে তা ছাড়তে হবে।'

'ছাড়া কি এতই সহজ? লোকে বলে একবার যে মানুষের মাংস খেয়েছে, আবার খাবার জন্যে পাগল হয়ে থকে সে।'

ওরা যখন যে-কথাই বলুক, কারেফিনোতুর চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। ভাষা না বুঝলেও, বক্তব্য বোধহয় আন্দাজ করে নিতে

পারে সে। তা না হলে ওরা কথা বললেই সে-ও কেন হড়বড় করে কিছু বলার চেষ্টা করবে? কিন্তু ওরা তার কথার একটা বর্ণও বুঝতে পারে না।

কারেফিনোতু শিশুর মত সরল হলেও, বোকা নয়। একবার কিছু শিখিয়ে দিলে আর ভোলে না। শেখেও খুব দ্রুত, মাত্র একবার দেখিয়ে দিলেই নিজে করতে পারে। গডফ্রে তাকে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই এক এক করে অনেক কাজ শিখিয়ে নিচ্ছে। পোষা প্রাণীগুলোর যত্ন নেয়া, ঝিনুক আর পাখির ডিম সংগ্রহ করে আনা, ফল পাড়া, ছাগল বা ভেড়ার মাংস কেটে টুকরো করা, বুনো আপেল নিঙড়ে রস বের করা।

টার্টলেট তাকে বিশ্বাস করতে রাজি নন, সব সময় সন্দেহের চোখে দেখছেন। কিন্তু গডফ্রে তাকে অবিশ্বাস করে না। লোকটাকে জংলীদের হাত থেকে বাঁচাতে পেরে নিজের ওপর ভারি খুশি সে।

গডফ্রের দুশ্চিন্তা কারেফিনোতুকে নিয়ে নয়, জংলীদের নিয়ে। ফিনা আইল্যান্ড চিনে গেছে তারা, জানে এখানে ওরা আছে, দল বড় করে আবার যদি তারা আসে, হামলা করে বসে?

গডফ্রে শুরু থেকেই উইল-ট্রির ভেতর মেহমানের শোয়ার ব্যবস্থা করেছে। তবে শুধু বৃষ্টি হলে গাছের ভেতর শোয় কারেফিনোতু। বৃষ্টি না হলে দরজার বাইরে রাত কাটায়। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে সে, যেন উইল-ট্রিকে পাহারা দেয়।

কারেফিনোতু দ্বীপে এসেছে আজ দু'হপ্তা। এরইমধ্যে বেশ কয়েকবার গডফ্রের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছে সে। বন্দুক থেকে 'গুড়ুম' করে আওয়াজ হলেই অনেক দূরের জন্তুগুলো আহত হয়ে ছিটকে পড়ছে, এটা দেখে তার বিস্ময় বাঁধ মানে না। তবে ধীরে ধীরে সে নিজেও বন্দুক চালানো শিখে ফেলল।

দ্রুত সব কিছু শিখে ফেলার গুণেই গডফ্রের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল কারেফিনোতু। তবে একটা কাজে সে একদমই সুবিধে করতে পারছে না। ইংরেজি ভাষার একটা শব্দও ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না সে। গডফ্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, কিন্তু ফলাফল শূন্য।

এরমধ্যে একদিন সৈকতে হাঁটতে হাঁটতে কাছিমের একটা আস্তানা আবিষ্কার করল কারেফিনোতু। গডফ্রে লক্ষ করল, ধাওয়া করে কাছিমগুলোকে চোখের পলকে চিৎ করে ফেলে সে। সেদিন অনেকগুলো কাছিম শিকার করল ওরা, শীতকালে রান্না করে খাওয়া যাবে। শীত আসতে আর খুব বেশি দেরিও নেই। অক্টোবরের মাত্র শুরু, এরইমধ্যে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া।

কাছিম শিকারের পর দ্বীপে ওদের জীবনযাত্রা আবার একঘেয়ে হয়ে পড়ল। রুটিন ধরে কিছু কাজ রোজই ওদেরকে করতে হয়। শীত শুরু হলে উইল-ট্রির মধ্যেই বন্দী থাকতে হবে সারাদিন, তখন যে সময়টা কি রকম বৈচিত্র্যহীন কাটবে, ভাবলেই গডফ্রের মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তবে মন খারাপ বলে জরুরী কাজগুলো অবহেলা করে না সে। রোজই সে দ্বীপটায় একটা চক্কর দিয়ে আসে। একেক দিন একেক দিকে যায়। শিকারেও প্রায় নিয়মিত বেরুচ্ছে। আজকাল সাধারণত কারেফিনোতুই তার সঙ্গে যায়। শিকারি হিসেবে দক্ষ নন, কাজেই টার্টলেট নিজেই যেতে চান না। তবে জীবনের প্রথম গুলিটা যে জাদু দেখিয়ে দিয়েছিল, এটা তিনি মাঝে মধ্যেই গডফ্রেকে স্মরণ করিয়ে দেন।

এই রকম একদিন শিকারে বেরিয়েছে ওরা। সেখানে এমন একটা ঘটনা ঘটল, উইল-ট্রির অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল।

দ্বীপের ঠিক মাঝখানে, টিলাগুলোর নিচে, হরিণ শিকার করতে

এসেছে ওরা। এদিকের জঙ্গল খুব গভীর, সবটা এখনও গডফ্রের দেখা হয়নি। সকালে জঙ্গলে ঢুকেছে ওরা, সেই থেকে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে মাত্র দু'তিনটে হরিণকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখল। অনেকটা দূরে ছিল ওগুলো, ফলে গুলি করলে কোন লাভ হত না। তাছাড়া, খালি হাতে ফিরবে না, এরকম কোন প্রতিজ্ঞা বা জেদ নিয়ে আসেনি গডফ্রে। উইল-ট্রিতে বর্তমানে খাবারের কোন অভাব নেই। শিকারে বেরিয়েও মাঝে মধ্যে খালি হাতে ফিরতে তার খারাপ লাগে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। ইতিমধ্যে এক জায়গায় বসে খেয়ে নিয়েছে ওরা। খাবার পর আরও কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করল, কিন্তু মনের মত কোন শিকার চোখে পড়ল না। আস্তানায় ফেরার জন্যে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে এবার। আর ঠিক তখনই হঠাৎ আঁতকে ওঠার আওয়াজ করল কারেফিনোতু।

প্রকাণ্ড এক লাফ দিল সে, উড়ে এসে পড়ল সরাসরি একেবারে গডফ্রের ঘাড়ের ওপর। তার আঁতকে ওঠার শব্দে ছুটতে শুরু করেছিল গডফ্রে। দেখা গেল কারেফিনোতু তার কাঁধে সওয়ার হয়ে রয়েছে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিশ গজের মত ছুটে এল গডফ্রে, তারপর কাঁধের বোঝা সহ মাটিতে পড়ে গেল।

দু'জন প্রায় একসঙ্গে সিধে হলো আবার। কারেফিনোতুর দিকে তাকাল গডফ্রে, চোখের দৃষ্টিতে একাধারে তিরস্কার ও প্রশ্ন। মুখে কিছু না বলে হাত তুলে কিছু একটা দেখাল কারেফিনোতু।

তার হাত অনুসরণ করে তাকাল গডফ্রে। তাকাতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

প্রকাণ্ড এক ভালুক! ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসে ওদের দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে হিংস্র জানোয়ারটা, আর ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। ওদের সঙ্গে এখন যদি প্রফেসর টার্টলেট থাকতেন,

তিনি হয়তো বেহালা বাজিয়ে ভালুকটাকে শান্ত করার বুদ্ধি দিতেন। কিন্তু গডফ্রের মাথায় কোন বুদ্ধিই এল না। ভয়ে দিশেহারা বোধ করছে সে। ভঙ্গি দেখে মনে হলো, ভালুকটা ওদেরকে তাড়া করবে।

জন্তুটার দিকে পিছন ফিরতে সাহস পাচ্ছে না গডফ্রে, তাই পিছু হটতে শুরু করল সে। ইঙ্গিতে কারেফিনোতুকেও তাই করতে বলছে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটলই, ঠেকানো গেল না। ওদেরকে নড়তে দেখেই তেড়ে এল অতিকায় ভালুকটা।

নিজের জান বাঁচানোর চেয়ে উইল-ট্রির নিরাপত্তার কথাই বেশি ভাবছে গডফ্রে। ভালুকটা যদি তাদের পিছু নিয়ে আস্তানাটা দেখে ফেলে, সব ভেঙেচুরে একাকার করে ফেলবে। একবার সে ভাবল, অন্য কোন দিকে ছুটলে কেমন হয়, ভালুকটা তাতে উইল-ট্রি দেখতে পাবে না। কিন্তু ধারণাটা তখুনি বাতিল করে দিল সে। ওটার সঙ্গে দৌড়ে পারা যাবে না, একটু পরই ওদেরকে ধরে ফেলবে। আর একবার নাগাল পেলে বাঁচার কোন উপায় নেই।

ভালুক ছুটে আসছে। গডফ্রে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। সে যেন একটা পাঁচিল, কোন অবস্থাতেই ভালুকটাকে উইল-ট্রির দিকে যেতে দিতে রাজি নয়। আতঙ্কিত কারেফিনোতুও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয় গডফ্রেকে ফেলে পালাতে মন চাইছে না তার, নয়তো নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ইতিমধ্যে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে ভালুকটা। এই সময় নড়ে উঠল গডফ্রে। বন্দুক তুলেই গুলি করল সে।

গুলিটা লেগেছে কিনা, লাগলে কোথায় লেগেছে, কিছুই ওরা বলতে পারবে না। শুধু দেখল, ভালুকটা হঠাৎ পড়ে গেল। ওই দেখা পর্যন্তই, তারপর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি গডফ্রে, ঘুরেই ছুটতে শুরু করেছে। ভালুকটা মরল কিনা কে জানে। পরীক্ষা করে

দেখবে, সে সাহস তার নেই। ভালুক শুধু হিংস্র জন্তুই নয়, অসম্ভব চালাকও। কে বলবে আহত হবার ভান করে পড়ে আছে কিনা! না, কাছে যাবার মত বোকামি করতে রাজি নয় গডফ্রে।

গডফ্রের দেখাদেখি কারেফিনোতুও ছুটছে। একটু পর দেখা গেল গডফ্রের একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে সে। খানিকক্ষণ ছোটার পর পিছন ফিরে একবার তাকাল গডফ্রে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। না, ভালুকটা ওদের পিছু নিয়ে আসছে না।

দশ

প্রফেসর টার্টলেট ভয় পাবেন ভেবে ভালুকটার কথা বলবে কিনা এই নিয়ে দ্বিধায় ভুগছিল গডফ্রে। নানা দিক চিন্তা করে বলবারই সিদ্ধান্ত নিল সে। কিন্তু বলবার পর উপলব্ধি করল, বিরাট একটা ভুলই করে ফেলেছে।

'ভালুক!' আঁতকে উঠে তিনটে লাফ দিলেন প্রফেসর টার্টলেট। 'কি বললে? ভালুক? হঠাৎ ফিনা আইল্যান্ডে ভালুক আসবে কোত্থেকে? তুমি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ!' আতঙ্কে তাঁর মুখ নীলচে দেখাচ্ছে।

মাথা নেড়ে গডফ্রে বলল, 'না, ভুল দেখিনি। ওটা ভালুকই ছিল। তবে গুলি করার পর পড়ে যেতে দেখেছি, কাজেই আপনার এত ভয় পাবার কোন কারণ নেই।'

'ভয় পাবার কারণ নেই?' টার্টলেট বিস্মিত। 'একটা ভালুক

থাকলে দশটা থাকতে অসুবিধে কি? আর ভালুক যদি থাকে, কি করে বুঝব যে নেকড়ে, জাগুয়ার, বাঘ, সিংহ বা পাইথনও নেই?' ভয়ে ভয়ে এমনভাবে চারদিকে তাকাচ্ছেন তিনি, যেন বিশাল কোন চিড়িয়াখানার সমস্ত জীব-জন্তুকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তারা দল বেঁধে ওদের ওপর হামলা করতে ছুটে আসছে।

গডফ্রে তাঁকে শান্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল, এত অস্থির হবার কিছু নেই।

কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে টার্টলেট বললেন, 'আগে তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। এতদিন দ্বীপে কোন হিংস্র প্রাণী দেখা যায়নি, আজ হঠাৎ কেন একটা ভালুক দেখা গেল?'

গডফ্রে স্বীকার করল, 'হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা আমার কাছেও খুব আশ্চর্য লাগছে। আমিও এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে ভালুক একটা দেখা গেছে বলেই এটা ধরে নেয়া চলে না যে ফিনা আইল্যান্ডে আরও অনেক ধরনের হিংস্র প্রাণী আছে।'

'নেই যে তারই বা প্রমাণ কি?' আবার প্রশ্ন করলেন টার্টলেট।

'এ নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই,' বলল গডফ্রে। 'এখন যেটা উচিত, আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। অস্ত্র ছাড়া বাইরে ঘোরাফেরা করা চলবে না।'

'অর্থাৎ আমরা খুব বিপদের মধ্যে আছি।' প্রফেসর ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেলেন। দ্বীপে আসার পর এই প্রথম বাড়ি ফেরার প্রচণ্ড তাগাদা অনুভব করলেন তিনি। 'ঢের হয়েছে, গডফ্রে! যথেষ্ট হয়েছে! এবার পৈত্রিক প্রাণটা আমাকে বাঁচাতে হবে। জীবনের প্রতি আমার মায়া আছে, এটাকে হিংস্র জানোয়ারের মুখে তুলে দিতে পারি না। যেভাবেই হোক, দেশে ফিরতে হবে আমাকে। ফিরতেই হবে!'

ফিরতে হবে বললেই কি ফেরা যায়? একই কথা বারবার

বলছেন টার্টলেট। কিন্তু কিভাবে ফিরবেন তা তাঁর মাথায় আসছে না। তাঁর জন্যে দুঃখই হলো গডফ্রের। বিপদের ভয় টার্টলেটের চেয়ে তার কম নয়। কিন্তু ভয় পেয়ে চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। বিপদ এলে যাতে ঠেকানো যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। গডফ্রে চিন্তা করছে। শুধু যে জঙ্গলের দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে, তা নয়। যে-কোন দিক থেকে আসতে পারে। উইল-ট্রিও ওদের জন্যে নিরাপদ আস্তানা নয়। গডফ্রে সিদ্ধান্ত নিল, আস্তানার দরজাটা আরও মজবুত করতে হবে। পোষা প্রাণীগুলোর ওপরই সম্ভবত প্রথম হামলাটা আসবে। ওগুলোর জন্যেও মজবুত একটা খোঁয়াড় বানাতে হবে।

কিন্তু ভাল একটা খোঁয়াড় বললেই কি বানানো যায়? দেবদারু তলায় ডালপালা পড়ে আছে, সেগুলো কুড়িয়ে কোন রকমে একটা খাঁচামত তৈরি করা হলো, আপাতত এখানেই থাকবে ছাগল আর ভেড়ার পাল। মোরগ-মুরগির ঘর যথেষ্ট মজবুত, শুধু দরজাটা নতুন করে বসানো হলো।

কারেফিনোতুকে নিয়ে একটা সমস্যায় পড়েছে গডফ্রে। ইশারায় বারবার মানা করা সত্ত্বেও আগের মত বাইরে শুচ্ছে সে। এমন কি টানা-হ্যাঁচড়া করেও কোন লাভ হলো না। উল্টে সে আকার-ইঙ্গিতে গডফ্রেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, ভালুক যদি আসেই, ওদেরকে সময় থাকতে সাবধান করতে পারবে সে। তার প্রাণ বাঁচানো হয়েছে, সেই ঋণ এভাবেই সে শোধ করতে চাইছে।

ভালুক দেখার পর এক হপ্তা কেটে যাচ্ছে, হামলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। গডফ্রে খুব সাবধান হয়ে গেছে, আস্তানা ছেড়ে দূরে কোথাও যায় না। ছাগল-ভেড়াগুলো ঘাস খেতে এদিক সেদিক যায় বটে, কিন্তু ওগুলোকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে কারেফিনোতু। রাখালের ভূমিকায় কালো কাফ্রিটাকে মানিয়েছেও

বেশ। তার হাতে অবশ্য বন্দুক থাকে না, থাকে ধারাল একটা ভোজালি আর একটা কুড়ুল। গডফ্রেকে সে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে, এই দুটো অস্ত্র সঙ্গে থাকলে বাঘের সঙ্গেও লড়তে পারবে।

ভালুক বা অন্য কোন হিংস্র জন্তু হামলা না করায় আগের সাহস আবার ফিরে পেয়েছে গডফ্রে। এখন আবার সে আগের মত শিকারে বেরুচ্ছে। তবে খুব বেশি দূরে যায় না, বিশেষ করে টিলাগুলোর নিচের গভীর জঙ্গলটাকে সযত্নে এড়িয়ে চলে। মাঝে মধ্যে কারেফিনোতুকেও সঙ্গে নেয় সে।

তবে টার্টলেটের ভয়-ভীতি এখনও দূর হয়নি। হামলার ভয়ে সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত থাকেন তিনি। ভালুকের কথা শোনার পর থেকে দেবদারুর আস্তানা থেকে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বেরুচ্ছেন না। কোটরের ভেতর সশস্ত্র অবস্থায় বসে থাকেন। তবে অলস সময় কাটান না। কারেফিনোতুর কোন কাজ না থাকলে তাকে ইংরেজি শেখাবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু অধ্যাপকের অধ্যাপনা কোন কাজেই আসছে না। যতই তিনি চেষ্টা করুন, কারেফিনোতু একটা শব্দও শিখতে পারছে না। এক সময় বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হলো তাঁকে। অবশ্য বললেন, 'তুমি যখন আমার ছাত্র হতে পারলে না, দেখা যাক আমি তোমার ছাত্র হতে পারি কিনা। এসো, আমাকে তোমার ভাষা শেখাও

শুনে হেসে ফেলল গডফ্রে। বলল, 'ওর ভাষা শিখে আমাদের কি লাভ?'

'এখন বোঝা না গেলেও, লাভ একটা নিশ্চয়ই আছে,' বললেন টার্টলেট

শিক্ষকের বক্তব্য মেনে নিয়ে চুপ করে থাকল গডফ্রে।

শুরু হলো ক্লাস। হাতে যে-কোন একটা জিনিস নেন টার্টলেট, ইঙ্গিতে সেটার নাম বলতে বলেন কারেফিনোতুকে। এভাবে চলল তাঁর ভাষা শেখার চেষ্টা। পনেরো দিন পর দেখা গেল পনেরোটা শব্দ শেখা হয়েছে। পলিনেশিয়ান ভাষায় আগুনকে বলে 'বিরসি', আকাশকে 'আরাদোরে', সাগরকে 'মেরভিরা', বৃক্ষকে 'ডোউরা' এরকম সব মিলিয়ে পনেরোটা শব্দ শিখে গর্বে তাঁর মাটিতে পা পড়ে না। নিজের ঢাক নিজেই তিনি পেটাতে লাগলেন। 'ছাত্র হিসেবে নিশ্চয়ই আমি মেধাবি। কারেফিনোতু যেখানে একটা শব্দও শিখতে পারল না, সেখানে মাত্র পনেরো দিনে আমি কিভাবে পনেরোটা শব্দ শিখলাম?'

গডফ্রে বলল, 'ভাষা শেখাতে পারছেন না তো কি হয়েছে, আপনি ওকে নাচ শেখাচ্ছেন না কেন?'

ব্যস, নতুন আরেকটা নেশা পেয়ে বসল টার্টলেটকে। সেই থেকে রোজই তিনি কারেফিনোতুকে নাচের তালিম দিচ্ছেন। কথাটা কৌতুক করে বলেছিল গডফ্রে, ওদের দু'জনের কাণ্ড দেখে এবার হাসতে হাসতে দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো তার। নাচতে গিয়ে এমন দাপাদাপি করে কারেফিনোতু, কিছুক্ষণ পরই ঘামে নেয়ে ওঠে, হাঁপাতে শুরু করে হাপরের মত। ঘাম ঝরে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে, লাফালাফি হয়, কিন্তু নাচের একটা মুদ্রাও শেখা হয় না। কারেফিনোতুর উৎসাহ প্রবল, কিন্তু তার কাঁধের হাড় অসম্ভব শক্ত, হাজার চেষ্টা করলেও বুকটা সামনে আনতে পারে না, হাঁটু জোড়াকে ঠিকমত বাঁকা করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু সহজে হাল ছাড়তে রাজি নন টার্টলেট, তারপরও তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

'দেখে শেখ রে গণ্ডমূর্খ, দেখে শেখ!' দাঁতে দাঁত চাপেন টার্টলেট, তারপর নিজেই নেচে দেখান। 'পা জোড়া সামনে বাড়া,

আরও সামনে! পায়ের গোড়ালি কাছাকাছি নিয়ে আয়। ওরে গর্দভ, ওভাবে নয়, ওভাবে নয়– এভাবে! দূর বোকা, দূর আহাম্মক, হাঁটু দুটো আরও ফাঁক করতে পারিস না? মাথা সোজা রাখ, কাঁধ পিছিয়ে নে, কনুই দুটো বাঁকা কর…নাহ্, তুই সত্যি একটা গবেট। তোর দ্বারা আসলেও কিছু হবে না।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল গডফ্রে। তারপর বলল, 'এ আপনার অন্যায় অ বদার, স্যার। আপনি ওকে অসম্ভবকে সম্ভব করতে বলছেন!'

'কেন, অসম্ভব হবে কেন? কারেফিনোতু তো অন্য সব কাজে যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বুদ্ধিমান লোকের জন্যে কোন কাজই অসম্ভব নয়।'

'কিন্তু ওর শরীরের গড়নটা লক্ষ করেছেন? লক্ষ করেছেন হাড়গুলো কি রকম শক্ত?'

'অতশত বুঝি না, নাচ ওকে শিখতেই হবে,' জেদ ধরলেন প্রফেসর টার্টলেট। 'আমরা যখন এই দ্বীপ থেকে সভ্য জগতে ফিরব, আমাদের সঙ্গে ও-ও তো যাবে, তাই না? ওকে তো আমরা এখানে ফেলে রেখে যেতে পারব না। ভেবে দেখেছ, তখন কি হবে? ভদ্রলোকদের পার্টিতে ওকে যেতে হবে না? নাচ না জানলে লোকে হাসবে যে! বলবে, এ আবার কি অসভ্যতা!'

'সভ্য জগতে যাওয়া, ভদ্রলোকদের পার্টিতে অংশগ্রহণ, এ-সব ওর কপালে আছে বলে মনে হয় না,' মন্তব্য করল গডফ্রে।

'কি বললে? ওর ভাগ্যে কি আছে না আছে তুমি তা কিভাবে বলো?' রেগে গেলেন প্রফেসর। 'তুমি কি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও?'

টার্টলেটের সঙ্গে কোন আলোচনা সুষ্ঠুভাবে করা যায় না। চূড়ান্ত একটা মন্তব্য করে সব আলোচনাই থামিয়ে দেন তিনি। তাঁর কথার ওপর আর কেউ যাতে কথা বলতে না পারে,

আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ পকেট-বেহালা বের করে বাজাতে শুরু করে দেন। কারেফিনোতু তো বুঝতেই পারে না কি নিয়ে তর্ক হচ্ছে, সে বেহালার টু-টাং শুনে চিংড়ি মাছের মত তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে শুরু করল। এই লম্ফঝম্পকেই সে নাচ বলে জানে। পলিনেশিয়ান নাচ আর কি!

ভালুকটার কথা ওরা কেউ ভোলেনি। এ নিয়ে প্রায় রোজই আলোচনা হচ্ছে। কোন হামলা হয়নি দেখে টার্টলেটও ইদানীং সাহস ফিরে পেয়েছেন। তাঁর ধারণা, গডফ্রে কোন ভালুক দেখেনি।

'কিন্তু আমি তো একা নই, কারেফিনোতুও দেখেছে,' বলল গডফ্রে। 'ভালুকটা রীতিমত ধাওয়া শুরু করেছিল আমাদের। নাহ্, ভুল দেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভুল দেখলে গুলি করলাম কাকে?'

'ধরে নিলাম ওটা ভালুকই ছিল, এবং সেটাকে তুমি গুলি করে মেরেও ফেলেছ,' বললেন টার্টলেট। 'কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থাকে। এই দ্বীপে ভালুক যদি থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই একটা নেই। প্রশ্ন হলো, বাকি ভালুককে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন? ভালুক থাকলে অন্য আরও হিংস্র জন্তুও থাকবে। সেগুলোই বা কোথায়?'

গডফ্রে স্বীকার করল, গোটা ব্যাপারটা তার কাছেও মস্ত একটা ধাঁধার মত লাগছে।

ধাঁধাটা আরও জটিল হয়ে উঠল পরদিন। এতদিনে সাহস করে সেই জঙ্গলের দিকে ঘুরতে গেল গডফ্রে। ভালুকটাকে যেখানে ওরা দেখেছিল সেখানে কিছুই নেই। অনেক খুঁজেও লাশটা পাওয়া গেল না। এমন অবশ্য হতে পারে যে যেখানে গুলি খেয়েছে সেখানে ভালুকটা মরেনি। আহত অবস্থায় অন্য কোন দিকে চলে গেছে, তারপর মারাও যেতে পারে, আবার সুস্থ হয়েও

উঠতে পারে।

কিন্তু গুলি তো লেগেছিল, তাই না? তাহলে গাছতলায় রক্তের দাগ নেই কেন? নাহ্, এই রহস্যের কোন কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না।

নভেম্বর মাসে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। এই দ্বীপ কোন দ্রাঘিমায় তা ওদের জানা নেই, কাজেই এই বৃষ্টি বর্ষার সূচনা কিনা বলা সম্ভব নয়। একবার শুরু হবার পর থামাথামির নাম নেই, ঝম ঝম করে ঝরছে তো ঝরছেই। এই বৃষ্টির মধ্যেই হয়তো শীত চলে আসবে। শীতের মধ্যে এভাবে বৃষ্টি পড়তে থাকলে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠবে। গডফ্রে সিদ্ধান্ত নিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের আস্তানার ভেতর একটা ফায়ারপ্লেস তৈরি করা দরকার। ফায়ারপ্লেস থাকলে হাত-পা গরম করা যাবে, বৃষ্টির দিনে রান্না করাও যাবে। কিন্তু ধোঁয়া বের করার কি উপায়?

লম্বা একটা বাঁশ কেটে নল তৈরি করা যায়, গিঁটগুলো চেঁছে নিলেই হবে। গডফ্রে ভাবল, এ-ব্যাপারে কারেফিনোতু হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারে। আকার-ইঙ্গিতে অনেকক্ষণ ধরে বোঝানো হলো তাকে ঠিক কি চাইছে গডফ্রে। বুঝতে সময় নিল সে, কিন্তু একবার বোঝার পর কাজটা করে দিল খুব দ্রুত—বাঁশের ভেতর দিকের গিঁটগুলো নিখুঁতভাবে চেঁছে বের করে ফেলল। আগুন জ্বাল্যার পর দেখা গেল সমস্ত ধোঁয়া সদ্য তৈরি চিমনি দিয়ে কোটরের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে খেয়াল রাখতে হলো বাঁশে যাতে আগুন ধরে না যায়।

বুদ্ধি করে চিমনিটা তৈরি করেছিল বলে রক্ষা, তা না হলে সাংঘাতিক ভুগতে হত ওদেরকে। নভেম্বরের তিন থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত কোন বিরতি ছাড়াই ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ল। এই কদিন বাইরে আগুন জ্বালা সম্ভব ছিল না। উইল-ট্রির ভেতর থেকে

একবারও কেউ বেরুল না ওরা। ভেতরে আগুন জ্বলছে, কাজেই রান্নাবান্নার কাজে কোন সমস্যা হলো না। ঠাণ্ডাও ঠেকিয়ে রাখা গেছে। তবে অন্য একটা সমস্যা হলো–যব থেকে আটা বানিয়ে রেখেছিল ওরা, তাতে টান পড়ে গেল। অতিরিক্ত যবও ছিল না যে আটা বানিয়ে নেবে। দশ তারিখে গডফ্রে জানাল, বৃষ্টি একটু কমলেই কারেফিনোতুকে নিয়ে বেরুবে সে, খেত থেকে বেশি করে যব নিয়ে আসবে।

সেদিন সন্ধের খানিক আগে পশ্চিমা বাতাস আকাশের সমস্ত মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এক সময় সূর্যকেও দেখা গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

রাতে আকাশ ভরা তারা উঠল। খাওয়াদাওয়া শেষ হতে কারেফিনোতু জানাল, আজ থেকে আবার আস্তানার বাইরে শোবে সে। গডফ্রে আপত্তি করল, বলল, বুনো জানোয়ারকে নাহয় সে ভয় করে না, কিন্তু ভেজা মাটিতে শুলে যে তার ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসবে! কিন্তু কারেফিনোতুর একই জেদ, বাইরেই শোবে সে, কারণ উইল-ট্রির ভেতর শুলে তার ঘুম আসতে চায় না। অগত্যা রাজি হতে হলো গডফ্রেকে।

পরদিন সকালে সূর্য উঠল। দিনটা সোনালি আলোয় ঝলমল করছে। দুটো থলে নিয়ে গডফ্রে আর কারেফিনোতু যব খেতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বেরুবার সময় প্রফেসর টার্টলেটকেও সঙ্গে নিতে চাইল গডফ্রে, তিনজন গেলে বেশি করে যব আনা যাবে। কিন্তু কাদায় পা ডোবাতে রাজি হলেন না তিনি

নদীর তীর ধরে ওরা দু'জন যব খেতে পৌঁছাল। দ্রুত হাতে কাজ শুরু করলেও, থলে দুটো ভরতে তিন-চার ঘণ্টা লেগে গেল ওদের। এগারোটার দিকে থলে দুটো কাঁধে ফেলে ফেরার জন্যে রওনা দিল ওরা। দু'জনেই খুব সাবধান, চারপাশে নজর রেখে

হাঁটছে পরস্পরের ভাষা বোঝে না, তাতে একটা সুবিধে হলো—কথা না হওয়ায় চারপাশে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারছে

নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানটায় গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেশ ক'টা গাছ। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গডফ্রে। আতঙ্কে নীল হয়ে গেল তার মুখ হাত তুলে এবার সে-ই গাছতলাটা দেখাল। মাংসখেকো এক ভয়ঙ্কর জন্তু! চোখগুলো আগুনের মত জ্বলছে।

'বাঘ! বাঘ!' চিৎকার দিল গডফ্রে, মনে নেই তার ভাষা কারেফিনোতু বোঝে না।

ব্যাপারটা দৃষ্টিভ্রম নয়। সত্যি ওটা মস্ত একটা বাঘ। পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে একেবারে তৈরি হয়ে আছে।

গডফ্রের কাঁধ থেকে খসে পড়ল ভারী থলে, আরেক কাঁধের বন্দুক চলে এল হাতে। লক্ষ্যস্থির করতে যে-টুকু সময় লাগল, ট্রিগার টানতে এক সেকেন্ডও দেরি করল না।

এবার কোন সন্দেহ নেই, এক গুলিতেই পাক খেয়ে ছিটকে পড়ল বনের রাজা। পড়ল ঠিকই, কিন্তু মারা গেল কিনা বলা মুশকিল। আহত বাঘ সাক্ষাৎ আজরাইল নাগালের মধ্যে পেলে একেবারে ফেড়ে ফেলবে। আবার গুলি করার জন্যে বন্দুক তুলল গডফ্রে। কিন্তু চোখের নিমেষে ঘটে গেল আরেক ঘটনা। গডফ্রে আঁতকে উঠে বাধা দেয়া সত্ত্বেও কারেফিনোতু তার কথায় কান দিল না, খাপ খোলা ভোজালি হাতে বাঘের দিকে ছুটে গেল সে চিৎকার করে তাকে ফিরে আসতে বলছে গডফ্রে। শুনেও না শোনার ভান করছে কারেফিনোতু। উপায় না দেখে তাকে ধরার জন্যে গডফ্রেও এবার বাঘের দিকে ছুটল।

নদীর বাঁকে পৌঁছে গডফ্রে দেখল বাঘটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি

করছে কারেফিনোতু। চোখে দেখেও গডফ্রের বিশ্বাস হতে চাইল না–এক হাতে বাঘের গলা পেঁচিয়ে ধরেছে সে, অপর হাতের ভোজালিটা হাতল পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল ওটার বুকে। তারপর পিছিয়ে এল কারেফিনোতু। ঢাল থেকে গড়িয়ে নদীতে পড়ে গেল বাঘ। পানিতে ভীষণ স্রোত, পাক খেতে খেতে ছুটছে। সেই পানির ঘূর্ণিতে পড়ে ডুবে গেল জন্তুটা, স্রোতের টানে ভেসে গেল সাগরের দিকে।

প্রথমে ভালুক দেখল ওরা, আজ আবার বাঘ! আশ্চর্যই বলতে হবে যে হঠাৎ ফিনা আইল্যান্ডে এক এক করে হিংস্র জন্তুদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। কি যেন গভীর রহস্য আছে এ-সবের মধ্যে, কিন্তু সেটা যে কি তা ঠাহর করা যাচ্ছে না। যা কিছু ঘটছে, স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে মন চাইছে না গডফ্রের। দ্বীপটা যে নিরাপদ নয়, এখন আর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কাছে এসে গডফ্রে দেখল, বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আহত হয়েছে কারেফিনোতু। কালো কুচকুচে কাফ্রির শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় রক্তভরা আঁচড়ের দাগ।

গডফ্রে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। ফেরার সময় কারেফিনোতুকে কিছু বলল না সে। কারেফিনোতুর আচরণও যে অত্যন্ত রহস্যময়, এটা সে বুঝতে পারছে। বারণ করা সত্ত্বেও একটা বাঘের সঙ্গে কেন সে লড়তে গেল? ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, বাঘটাকে সে এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। ব্যাপারটা কি?

এগারো

শুধু ভালুক নয়, দ্বীপে বাঘও আছে, এ-কথা শুনে ম্যালেরিয়ার রোগীর মত কাঁপতে লাগলেন প্রফেসর টার্টলেট। শুধু কাঁপছেন না, সেই সঙ্গে প্রলাপও বকছেন। 'এই দ্বীপে থাকতে হলে পাথরের দুর্গ চাই, পাথরের দুর্গ! তা না পেলে এখুনি আমি দেশে ফিরব–এখুনি!'

'দেশে তো আমিও ফিরতে চাই,' শান্ত গলায় বলল গডফ্রে। 'কিন্তু কিভাবে যাব সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'আবার তোমাকে আমি প্রশ্ন করছি, গডফ্রে!' চিৎকার করছেন প্রফেসর টার্টলেট। 'চারমাস হলো এই দ্বীপে আছি আমরা। এতদিন কোন হিংস্র জন্তু দেখিনি। আজ হঠাৎ কেন একের পর এক দেখতে পাচ্ছি?'

'এর উত্তর আমার জানা নেই, স্যার,' সত্যি কথাই বলল গডফ্রে। 'ব্যাপারটা আমার কাছেও অত্যন্ত দুর্বোধ্য।'

'আমি বলি কি, দ্বীপ ছেড়ে পালানোর যখন কোন উপায় নেই, এসো, আমাদের এই আস্তানাকে আমরা দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে ফেলি।'

'কিভাবে?'

'উইল-ট্রির চারপাশে আরও কয়েকটা দেবদারু গাছ রয়েছে, ঠিক? ওগুলোকে খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে উইল-ট্রির চারপাশে

একটা মজবুত বেড়া তৈরি করা যায়।'

প্রস্তাবটা গডফ্রের মনে ধরল। কাজটায় যথেষ্ট খাটনি আছে, তবে খাটনিকে সে ভয় পায় না। তাছাড়া, তাকে একাই সব করতে হবে না–কারেফিনোতু আর টার্টলেট সাহায্য করবেন। দেরি না করে তখুনি ওরা কাজে লেগে গেল।

পাইন বনটা নদীর ধারে, ওদের আস্তানা থেকে এক মাইল দূরে। পাইনের ডালপালা দিয়ে বেড়াটা তৈরি করা হবে। রোজ সকালে রুটিন হয়ে দাঁড়াল কাজটা, কুড়ুল নিয়ে তিনজনই বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে খাবার থাকে, ফলে সন্ধের আগে আস্তানায় না ফিরলেও চলে। কাজটা ওরা যত কঠিন ভেবেছিল, হাত দেয়ার পর দেখা গেল তারচেয়েও কঠিন। পাইন বন থেকে কাঠ আর ডালপালা কেটে আনতেই সতেরো তারিখ পার হয়ে গেল। আকাশে আবার নতুন করে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। মাথার ওপর প্রায় সব সময় মেঘ থাকে, মাঝে মধ্যে বৃষ্টিও হচ্ছে।

বেড়াটা তৈরি করতে আরও এক হপ্তা লেগে গেল। তৈরি হবার পর তিনজনই স্বীকার করল, তাদের ঘাম ঝরানো পরিশ্রম সার্থক হয়েছে–যে-কোন বিচারে অত্যন্ত মজবুত হয়েছে বেড়াটা। শুধু গাছগুলোকে খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি, ওগুলোর মাঝখানে মোটা মোটা ডালও পোঁতা হয়েছে মাটিতে। বেড়াটা এত উঁচু, হিংস্র কোন জন্তুর পক্ষেও লাফ দিয়ে টপকানো সম্ভব নয়। গায়ের ধাক্কায় ভেঙে ফেলতেও পারবে না।

বেড়া তৈরি শেষ, বাকি শুধু বেড়ার মাঝখানে একটা দরজা বসানো। সাতাশ তারিখ সকালে সেই কাজটাই করছিল গডফ্রে। হঠাৎ এমন একটা রহস্যময় কাণ্ড ঘটল, ফিনা আইল্যান্ডের পুরানো ধাঁধাটা আরও জটিল হয়ে উঠল ওদের কাছে।

উইল-ট্রির মগডালে উঠেছে কারেফিনোতু, ওদের আস্তানার

মাথার দিকের ফুটোগুলো বন্ধ করবে। হঠাৎ দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল সে। তাড়াতাড়ি দূরবীন নিয়ে গাছ বেয়ে মগডালে উঠে এল গডফ্রে। হাত তুলে তাকে উত্তর-পুব দিকটা দেখাল কারেফিনোতু। সেদিকে তাকাতেই বিষম একটা ধাক্কা খেলো গডফ্রে।

কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছে আকাশে।

'আবার!' বিড়বিড় করল গডফ্রে। ধোঁয়ার উৎস প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে, দ্বীপের অন্য এক প্রান্তে। আগুনটা বেশ বড়ই হবে, কারণ বেশ মোটা একটা স্তম্ভের মত পাক খেতে খেতে উঠছে ধোঁয়াটা। 'এবার এই রহস্যের সমাধান আমাকে করতেই হবে,' গডফ্রের গলায় জেদ। কারেফিনোতুকে নিয়ে দ্রুত গাছ থেকে নেমে এল সে। কিছু খাবারদাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দু'জন, প্রফেসর টার্টলেট থাকবেন আস্তানার পাহারায়।

সাঁকো পার হয়ে নদীর ডান তীরে চলে এল ওরা, তারপর ঘাসজমির ওপর দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। সৈকতের প্রথম সারি পাথরগুলোর কাছে পৌঁছাতে বেলা বারোটা বেজে গেল। ইতিমধ্যে এক জায়গায় থেমে দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিয়েছে। আকাশের গায়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী এখন আরও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। আর সম্ভবত সিকি মাইল এগোলে ধোঁয়ার উৎসটা দেখতে পাবে।

কিন্তু দু'মিনিট পর হঠাৎ করে ধোঁয়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হলো কেউ যেন তাড়াহুড়ো করে আগুনটা নিভিয়ে দিয়েছে। দেবদারু গাছের মাথা থেকে জায়গাটা অবশ্য চিনে রেখেছে গডফ্রে, খুঁজে নিতে কোন অসুবিধে হবে না। সে ধোঁয়া উঠতে দেখেছে তেকোনা একটা পাথরের আড়াল থেকে, পাথরটা

পিরামিড আকৃতির।

পঞ্চাশ গজ দূর থেকে পিরামিডটা দেখতে পেল ওরা। ছুটল গডফ্রে কিন্তু কাছে এসে দেখল, কেউ নেই। শুধু আধ পোড়া কিছু কাঠ আর বেশ খানিকটা ছাই পড়ে আছে। 'কেউ না কেউ এখানে ছিল দু'মিনিট আগেও ছিল। তার বা তাদের পরিচয় আজ আমাকে জানতেই হবে।' বুক ভরে বাতাস নিল গডফ্রে, তারপর চিৎকার করে ডাকল, 'কে তোমরা? সামনে এসো, দেখা দাও!'

কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

নিজের ভাষায় কারেফিনোতুও চিৎকার করে ডাকল। এবারও কেউ সাড়া দিল না। আশপাশের সবগুলো পাথরের আড়ালে খোঁজাখুঁজি করল ওরা সৈকতের প্রতিটি গুহা, গর্ত, সুড়ঙ্গে তল্লাশী চালাল। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। অগত্যা বাধ্য হয়ে আস্তানায় ফেরার জন্যে ফিরতি পথ ধরল ওরা।

হাঁটতে হাঁটতে এটা-সেটা অনেক কথাই ভাবছে গডফ্রে। ফিনা আইল্যান্ডে তবে কি ভূত আছে? নাকি এই দ্বীপে লুকিয়ে আছে কোন জাদুকর? বারবার ধোঁয়া দেখতে পাবার কারণ কি? হঠাৎ করে হিংস্র জানোয়ারই বা আসছে কোত্থেকে?

হঠাৎ গডফ্রেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল কারেফিনোতু। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল গডফ্রে। বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি, ধীরে ধীরে সিধে হচ্ছে, দ্রুত একটা সাপকে পালিয়ে যেতে দেখল। 'আশ্চর্য!' বিহ্বল দেখাচ্ছে গডফ্রেকে। 'একের পর এক এ-সব কি হচ্ছে! প্রথমে ভালুক দেখলাম, তারপর বাঘ, এখন আবার সাপ!'

সাপ পালাচ্ছে, কিন্তু কারেফিনোতু সেটাকে কোন মতেই পালাতে দেবে না। পিছু ধাওয়া করে সাপটার গায়ে কুড়ুল দিয়ে কোপ মারল সে। একটা সাপ মরল, কিন্তু ঘাসের ভেতর আরও

কয়েকটা সাপ দেখতে পেল ওরা। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল গডফ্রে। 'কারেফিনোতু, দৌড়াও!' বলে নিজেও ছুটল সে। একের পর এক বিস্ময়ের ধাক্কায় তার মাথাটাই না খারাপ হয়ে যায়। হঠাৎ করে এত সাপ এল কোত্থেকে? গডফ্রের ভয় লাগছে–আরও কোন বিপদ ওত পেতে নেই তো?

আছে; বিপদ আছে। তা-ও ছোটখাট বিপদ নয়।

নদীর ধারে এসে থমকে দাঁড়াল গডফ্রে। উইল-ট্রির দিক থেকে একটা আর্তচিৎকার ভেসে আসছে। শুরু হবার পর চিৎকারটা থামছে না। গলাটা ওদের পরিচিত। 'জলদি, কারেফিনোতু, জলদি!' বলেই ছুটল গডফ্রে। 'প্রফেসর টার্টলেট নিশ্চয়ই কোন সাংঘাতিক বিপদে পড়েছেন!'

সাঁকো থেকেই দেখা গেল প্রফেসরকে। মাত্র দশ-বারো গজ দূরে তিনি, নদীর কিনারা ধরে প্রাণপণে ছুটছেন। তাঁকে ধাওয়া করছে হাঁ করা প্রকাণ্ড একটা কুমির। গা ভেজা, তারমানে একটু আগেই ওটা পানি থেকে উঠে এসেছে। টার্টলেট যখন মনের আনন্দে ছোটেন, দেখে মনে হয় নাচতে নাচতে এঁকেবেঁকে ছুটছেন; কিন্তু এই মুহূর্তে আতঙ্কে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন যে সে-সব ভুলে নাক বরাবর সোজা ছুটছেন, ফলে তাঁর নাগাল পাবার সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে গেছে কুমিরের। বিপদের ওপর বিপদ, অকস্মাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। এবার আর তাঁর রক্ষা নেই।

থমকে গেছে গডফ্রে, একচুল নড়ছে না। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের এই চরম বিপদের সময় মাথাটা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে সে। বন্দুকটা তুলে সাবধানে, গভীর মনোযোগ দিয়ে, লক্ষ্যস্থির করল। গুলি করতেই তড়াক করে একটা লাফ দিল কুমির, ছিটকে পড়ে গেল একপাশে। একটা ঝড়ের মত গডফ্রেকে পাশ কাটাল

কারেফিনোতু, ঝট করে প্রফেসর টার্টলেটকে নিজের কাঁধে তুলে নিল।

সন্ধে ছ'টা, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সঙ্গীদের নিয়ে আস্তানায় ফিরল গডফ্রে। আজকের আলোচ্য বিষয় বাঘ-ভালুক-সাপ-কুমির আর ধোঁয়া। ফিনা আইল্যান্ডে এসব কি ঘটছে! কে বা কারা বারবার রহস্যময় আগুন জ্বালছে? হঠাৎ করে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারগুলোই বা আসবে কোত্থেকে?

কে জানে আরও কত রকম বিপদ ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

প্রফেসর টার্টলেট বারবার সেই পুরানো কথাটাই বলছেন, 'গডফ্রে, এখানে থাকলে ভয়েই আমার হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে। যেভাবে পারো এই দ্বীপ থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো আমাকে। এখানে আমি আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না।'

তাকে অভয় দিয়ে কিছু বলা দরকার। কিন্তু গডফ্রে বোবা হয়ে বসে থাকল।

বারো

শুরুতেই হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়তে বোঝা গেল শীতটা কেমন ভোগাবে। উইল-ট্রির ভেতর ফায়ারপ্লেস তৈরি করায় ওদের অবশ্য আরামেই থাকার কথা। একে তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তার ওপর প্রায় দেড় মাস ধরে রোজই ঝড়-বৃষ্টি লেগে থাকল—এমনও হলো

যে পরপর কয়েকদিন আস্তানা ছেড়ে ওরা কেউ বেরুতেই পারল না।

সিন্দুক থেকে গরম কাপড়চোপড় বের করা হলো। সারাক্ষণ তুষার পড়ছে, কাজেই শিকারে বেরুনো বন্ধ। মাঝে দিন পনেরো জ্বরে ভুগল গডফ্রে। ওষুধের ছোট একটা বাক্স পাওয়া গেছে সিন্দুকে, এতদিনে সেটা কাজে লেগে গেল। পেটে ওষুধ না পড়লে জ্বরটা আরও বেশ কিছু দিন ভোগাত তাকে। জ্বর খুব বেশি উঠলে প্রলাপ বকেছে সে, ফিনার নাম ধরে ডাকাডাকি করেছে। দু'একবার মামার কথাও শোনা গেল। ইতিমধ্যে বিশ্বভ্রমণের শখ, রবিনসন ক্রুসো হবার সাধ মিটে গেছে তার। বয়েস হলেও, সে আসলে ছেলেমানুষই ছিল, ছিল রোমাঞ্চপ্রিয় ও অনভিজ্ঞ। বাস্তব জগৎকে বোঝার বা উপলব্ধি করার কোন চেষ্টাই কখনও করেনি। কিন্তু গত কয়েক মাসে গডফ্রে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন তাকে একজন নতুন মানুষই বলতে হবে।

ডিসেম্বর বিদায় নিল। প্রফেসর টার্টলেট কোন অসুখে পড়েননি, কিন্তু তবু তাঁকে সব সময় বিষণ্ন দেখায়। দেশে ফেরার তাঁর সেই ব্যাকুলতা আগের মতই আছে। আজকাল তিনি আর পকেট-বেহালায় কোন সুর তোলেন না।

হিংস্র জন্তুদের ভয়টা গডফ্রের মন থেকে এখনও দূর হয়নি। তার সন্দেহ, জংলীরাও যে-কোন দিন হামলা করতে পারে। বেড়াটা হয়তো জন্তুগুলোকে ঠেকাতে পারবে, কিন্তু জংলীদের পারবে না। সে ঠিক করল, আস্তানার ভেতর একটা সিঁড়ি তৈরি করবে। সিঁড়ি থাকলে খুব তাড়াতাড়ি দেবদারু গাছের মগডালে উঠে যাওয়া যাবে। টার্টলেটের মন খারাপ, কাজেই তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। কারেফিনোতুর সাহায্যে সিঁড়িটা একাই বানাল গডফ্রে।

তারপর বড়দিন এল। উইল-ট্রিতে ওরা খানাপিনার আয়োজন করল দু'একবার অনুরোধ করায় একটু নাচলেন টার্টলেট, একবার বেহালাও বাজালেন। কিন্তু কেউ তেমন খুশি হতে পারছে না। নতুন বছর ওদেরকে কোন আশার আলো দেখাতে পারল না। জাহাজটার নাম ছিল স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন ডুবে গেছে। ডোবা জাহাজের দু'জন যাত্রী এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। গত ছ'মাস ধরে সভ্যজগতের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। কেউ ওদের খোঁজ নিতে আসেনি, ওরাও কাউকে কোন খবর পাঠাতে পারেনি। কে জানে, সারা জীবনই হয়তো এই অভিশপ্ত দ্বীপে থেকে যেতে হবে ওদেরকে।

জানুয়ারি মাসের আঠারো তারিখ পর্যন্ত একটানা তুষারপাত হলো। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা, এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে গডফ্রে আর কারেফিনোতু, দু'জনের কারুরই ঘুম আসছে না। মশাল জ্বেলে এক ধারে বসে বাইবেলের পাতা ওল্টাচ্ছেন প্রফেসর টার্টলেট। হঠাৎ সবাইকে সচকিত করে দিয়ে দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল।

স্বাভাবিক কোন আওয়াজ নয়। একটা গর্জন। সেই রোমহর্ষক গর্জন ক্রমশ কাছে সরে আসছে। আর কোন সন্দেহ নেই, এবার সত্যি সত্যি বুনো জন্তুগুলো হামলা করতে আসছে। ওই তো বাঘ ডাকছে! ওই তো হায়েনা হাসছে! তারপর একে একে শোনা গেল চিতার ডাক, সিংহের হুংকার। ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গেল ওরা।

এভাবে দু'ঘণ্টা পার হলো। হিংস্র জানোয়ারগুলো একেবারে কাছে চলে এসেছে। এখনও তারা গর্জন করছে। তারপর হঠাৎ তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি দূরে সরে গেল। কিন্তু মাঝরাতের

খানিক পর আবার সব ক'টা ফিরে এল উইল-ট্রির কাছে। গডফ্রে চাপা গলায় বলল, 'আস্তে আস্তে ওগুলোর সাহস বাড়ছে। এই দ্বীপে থাকতে হলে এক এক করে সব কটাকে মারতে হবে।'

প্রফেসর টার্টলেট সাড়া দিলেন না। এক কোণে বসে ঠকঠক করে কাঁপছেন তিনি। কারেফিনোতু কাঁপছে না, তবে চেহারায় রাজ্যের বিস্ময়, ফ্যাল ফ্যাল করে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে।

ওদের পোষা প্রাণীগুলো ভয়ে আর্তনাদ করছে, ওগুলো সম্ভবত উইল-ট্রির তলায় আসতে চাইছে।

গডফ্রে বলল, 'বেড়ার দরজাটা খোলা দরকার।'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিল কারেফিনোতু। আস্তানা থেকে বেরিয়ে বেড়ার গেট খুলতেই লাফ-ঝাঁপ দিয়ে ভেতরে ঢুকল ছাগল ও ভেড়াগুলো। আর সেই গেটের ওপাশে দেখা গেল একজোড়া জ্বলন্ত চোখ! মনে হলো গডফ্রে গেটটা বন্ধ করারও সময় পাবে না, তার আগেই হিংস্র জন্তুটা ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। ঠিক এই সময় হ্যাঁচকা একটা টান অনুভব করল গডফ্রে। কারেফিনোতু তাকে টান দিয়ে ঢুকিয়ে নিল উইল-ট্রির ভেতর, পরমুহূর্তে দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা। কিন্তু বেড়ার গেট বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। কানের পাশে গর্জন শুনে বোঝা গেল, গেট দিয়ে ভেতরে তিন-চারটে জন্তু ঢুকে পড়েছে। জন্তুদের গর্জন, ছাগল-ভেড়ার আর্তনাদ, কারেফিনোতুর চিৎকার, সব মিলিয়ে ভৌতিক ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল পরিবেশ। পোষা প্রাণীগুলো কঠিন ফাঁদে আটকা পড়েছে। ভেতরে ঢোকার পর বেড়ার বাইরে বেরিয়ে যেতে পারছে না ওগুলো। না বুঝে ওগুলোকে যেন বলি দেয়া হলো।

গডফ্রে আর কারেফিনোতু জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। শুধু জন্তু-জানোয়ারদের ছুটোছুটি আর গর্জন শোনা যাচ্ছে। ওগুলো বাঘ না

সিংহ বোঝা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে ছাগল-ভেড়াগুলোকে মেরে ফেলছে। গর্জন আর ছুটোছুটির আওয়াজ শুনে মনে হলো আরও অনেক হিংস্র জন্তু ঢুকে পড়েছে বেড়ার ভেতর।

আতঙ্কিত প্রফেসর কাঁপা হাতে নিজের বন্দুকটা ধরলেন। জানালা দিয়ে ব্যারেল বের করে গুলি করতে যাচ্ছিলেন তিনি, গডফ্রে বাধা দিল। 'অন্ধকারে আপনি কাকে গুলি করবেন? শুধু শুধু বুলেট নষ্ট করার কোন মানে হয় না। ভোর হোক, তখন লক্ষ্যস্থির করে গুলি করবেন।' প্রফেসরকে বিশ্বাস নেই, গডফ্রে তাঁর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিল।

তাছাড়া, গডফ্রে যুক্তি দেখাল, প্রফেসরের গুলিতে ওদের পোষা প্রাণীগুলোও মারা যেতে পারে।

অকস্মাৎ গুলির শব্দে চমকে উঠল গডফ্রে। কে গুলি করল? তাকিয়ে দেখে, টার্টলেট! তার হাতে একটা রিভলভার! গডফ্রে জানালা আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই বন্ধ দরজার গায়ে গুলি করেছেন তিনি। দরজা ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে গেছে বুলেটটা।

'আপনার কি মাথা খারাপ হলো! এমন বোকামি কেউ করে!' শিক্ষককে তিরস্কার করল গডফ্রে। প্রফেসরের হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিল কারেফিনোতু।

গুলির আওয়াজ শুনে বুনো জন্তুগুলো আরও যেন খেপে উঠল। উইল-ট্রির গায়ে থাবা মারছে তারা। ওদের এই আস্তানা এবার না ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়!

'আর অপেক্ষা করা যায় না,' বলল গডফ্রে। একটা বন্দুক নিয়ে জানালার সামনে চলে এল সে। দেখাদেখি কারেফিনোতুও একটা বন্দুক তুলে নিল, দাঁড়াল দ্বিতীয় জানালার সামনে। গডফ্রের মনে পড়ল, কারেফিনোতু বন্দুক চালাতে জানে না। কিন্তু এই

মুহূর্তে তাকে মানা করার বা বাধা দেয়ার সময় নেই।

দুটো বন্দুক একসঙ্গে গর্জে উঠল। একবার নয়, বারবার। গুলির শব্দের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে আহত জন্তুদের আর্তনাদ। ওরা কিন্তু আন্দাজে গুলি ছুঁড়ে বুলেট অপচয় করছে না। বন্দুকের সামনে ঠিক যখন কুচকুচে কালো কাঠামো আর জ্বলন্ত চোখ দেখা যায়, তখনই বন্দুকের ট্রিগার টানছে। সিংহ, বাঘ, হায়েনা আর চিতার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে ওরা। তাদের কাতর আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে গুলি লাগছে।

দম ফেলার অবসর পাওয়া গেল বিশ মিনিট পর। উইল-ট্রির বাইরে বুনো জন্তুরা এখন চুপ করে আছে। ওগুলো কি আপাতত ফিরে গেছে? দিনের আলো ফুটলে ফিরে আসবে আবার? সাবধানের মার নেই, তাই জানালার সামনে থেকে নড়ল না ওরা। একটা কথা ভেবে গডফ্রের বিস্ময় বাঁধ মানছে না। জীবনে এই প্রথম বন্দুক চালাচ্ছে কারেফিনোতু, অথচ তার একটা গুলিও সম্ভবত ফস্কায়নি। ব্যাপারটা সত্যি অবিশ্বাস্য!

রাত দুটোর দিকে আবার শুরু হলো হামলা। এবারের আক্রমণ আগের চেয়েও প্রচণ্ড। বাইরে যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে। এমন কি উইল-ট্রির ভেতরটা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না। চারপাশ থেকে গর্জন করছে জন্তুরা, অথচ জানালা দিয়ে একটাকেও দেখা যাচ্ছে না। দেখা না গেলে ওরা গুলি করবে কাকে?

এরপর জন্তুগুলো দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কবাট থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। একবার যদি ওগুলো ভেতরে ঢুকতে পারে, তিনজনকেই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

'সিঁড়ে বেয়ে ওপরে ওঠো!' নির্দেশ দিল গডফ্রে। 'সোজা উঠে

যাও মগডালে!' ভাগ্যিস সিঁড়িটা বানিয়েছিল ওরা! বন্দুক, রিভলভার, গুলি, কার্তুজ ইত্যাদি নিয়ে তৈরি হয়ে গেল গডফ্রে আর কারেফিনোতু। প্রফেসর টার্টলেটকেও তাগাদা দিল গডফ্রে, 'দেরি করবেন না, স্যার! উঠুন!'

তাঁকে তাগাদা না দিলেও চলত। কথাটা বলে টার্টলেটের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল গডফ্রে, কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেল না। কারেফিনোতু ইঙ্গিত করায় ছাদের দিকে তাকাল সে। প্রফেসর টার্টলেট ঠকঠক করে কাঁপছেন ঠিকই, কিন্তু এরইমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে মগডালে পৌঁছে গেছেন।

কারেফিনোতুকে নিয়ে ত্রিশ ফুটও ওঠেনি গডফ্রে, উইল-ট্রির দরজা ভেঙে গেল। কোটরের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বুনো জন্তুগুলো। ভেতরে ওদেরকে না পেয়ে আক্রোশে গজরাচ্ছে তারা।

ওরা উঠছে, মগডাল থেকে আর্তনাদ ছাড়লেন প্রফেসর। গডফ্রে আর কারেফিনোতুকে বাঘ মনে করছেন তিনি। চোখ বুজে চিৎকার করছেন, ফলে ভুলটা তাঁর ভাঙছেও না। এক হাতে একটা ডাল ধরে ঝুলে আছেন, যে-কোন মুহূর্তে নিচে খসে পড়বেন। তাড়াতাড়ি পাশে এসে তাঁকে ধরে ফেলল কারেফিনোতু। বাঘ ওঠেনি, বুঝতে পেরে চওড়া একটা ডালে বসে নিজেকে সেই ডালের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধলেন টার্টলেট। গডফ্রে আর কারেফিনোতু বেশি ওপরে উঠল না, ফোকরটার মুখে বসার ব্যবস্থা করল। জন্তুগুলো ওপরে উঠছে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।

নিচে থেকে তর্জন-গর্জন ভেসে আসছে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এভাবেই সময়টা কাটতে লাগল ওদের। হঠাৎ ভোর চারটের দিকে নতুন আরেকটা বিপদ দেখে আঁতকে উঠল

গডফ্রে। গাছে আগুন লেগে গেছে। সে কি যা তা আগুন! একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলছে। ছাদের ফোকর দিয়ে ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। গডফ্রের মাথায় ব্যাপারটা ঢুকছে না। 'এ আবার কি রহস্য!'

রহস্য কিছুই নয়–জন্তুগুলো লাফালাফি করার সময় ফায়ারপ্লেসের আগুন চারদিকে ছড়িয়েছে, আর তাতেই প্রকাণ্ড এই দেবদারু গাছে আগুন ধরে গেছে। পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে ফায়ারপ্লেসটা তৈরি করেছিল গডফ্রে, এতদিন কোন অগ্নিকাণ্ড না ঘটার সেটাই কারণ। বুনো জন্তুগুলো ওদেরকে না পেয়ে ঘরের সমস্ত জিনিস-পত্র তছনছ করেছে, ফলে শুকনো গাছের গায়ে আগুন লাগতে সময় লাগেনি। হঠাৎ চারদিকের মাটি ও আকাশ কাঁপিয়ে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটল। সেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় গাছ থেকে ছিটকে একটু হলে পড়েই যাচ্ছিল ওরা। কি ব্যাপার? কি ঘটল? উইল-ট্রির ভেতর বাক্স ভর্তি গোলাবারুদ ছিল, সেটাই বিস্ফোরিত হয়েছে।

বাক্সটা থেকে কামানের গোলার মত বেরিয়ে আসছে গোলাবারুদ। কিছু জন্তু আহত হলো, কিছু ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু আগুনটা ক্রমশ বাড়ছে। গোটা দেবদারু গাছটাই বোধহয় পুড়ে যাবে। বেশ দ্রুতই ওপরে, অর্থাৎ ছাদের ফোকরের দিকে উঠে আসছে শিখাগুলো। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে এল ওদের। এই গাছে থাকলে ওদেরকে পুড়ে মরতে হবে। এত উঁচু গাছ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়াও সম্ভব নয়।

এই সময় মড় মড় করে একটা আওয়াজ শোনা গেল। উইল-ট্রির শিকড়ও পুড়ে গেছে, গোটা গাছটাই পড়ে যাচ্ছে কাত হয়ে।

কিন্তু উইল-ট্রি মাটিতে পড়ল না। আশপাশে আরও কয়েকটা প্রকাণ্ড গাছ রয়েছে, কাত হয়ে সেটার গায়ে হেলান দিল উইল-

ট্রি। মাটি থেকে অনেক ওপরে, পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী বাঁকানো একটা দোলনার মত, গাছটার মগডাল শূন্যে ঝুলে রয়েছে।

গাছটা মাটিতে পড়বে না, বুঝতে পেরে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল গডফ্রে। আর ঠিক তখনই কে যেন তার কানের কাছে বিড় বিড় করে বলল, 'উনিশে জানুয়ারি!'

চমকে উঠল গডফ্রে। কথাটা কে বলল?

বলল কারেফিনোতু! কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? সে তো ইংরেজি জানে না! ইংরেজি ভাষার একটা শব্দও তো তাকে দিয়ে উচ্চারণ করানো যায়নি। তাহলে?

'কি বললে তুমি?' গডফ্রে হতভম্ব। 'আবার বলো তো!'

'বলছিলাম যে আজই এখানে আপনার মামা মি. কোল্ডেরুপের পৌঁছানোর কথা, মি. গডফ্রে। তা যদি না পৌঁছান, তাহলে আর সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না–আমাদের সব ক'টাকে মরতে হবে।'

তেরো

কারেফিনোতু থামতেই উইল-ট্রির আশপাশ কোথাও থেকে কয়েকটা বন্দুক গর্জে উঠল। পরমুহূর্তে শুরু হয়ে গেল অঝোর ধারায় তুমুল বৃষ্টি।

বৃষ্টি শুরু হওয়ায় খুশি হলো গডফ্রে, উইল-ট্রির আগুনটা দেখতে দেখতে নিভে গেল। কিন্তু নতুন যে ধাঁধাটা শুরু হয়েছে,

তার কি ব্যাখ্যা দেবে গডফ্রে? কারেফিনোতু, যে কিনা এক বর্ণ ইংরেজিও জানে না, সেই কিনা চোস্ত মার্কিন উচ্চারণে কথা বলল! শুধু কি তাই? তাকে মি. গডফ্রে বলে সম্বোধনও করল। সেই সঙ্গে জানাল, উইল মামা নাকি ফিনা আইল্যান্ডে আজ আসবেন। সে থামল, অমনি কাছাকাছি কোথাও থেকে গর্জে উঠল কয়েকটা বন্দুক, যেন তার কথায় সায় দিয়েই। এ-সবের ব্যাখ্যা কি?

গাছপালার ফাঁক দিয়ে নিচে দেখা গেল কয়েকজন নাবিককে, ছুটে উইল-ট্রির দিকেই আসছে তারা। গডফ্রে আর দেরি করল না, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এল। কারেফিনোতুও তার পিছু নিল।

নিচে নামতেই দু'জন মানুষের গলা ঢুকল গডফ্রের কানে। এ এমন কণ্ঠস্বর, হাজার বছর পর শুনলেও চিনতে পারবে গডফ্রে।

'কী হে, ভাগ্নে? আছ কেমন?' সহাস্যে জানতে চাইলেন কোল্ডেরুপ।

'গডফ্রে!' ফিনার গলায় আনন্দ ও উল্লাস।

'উইল-মামা, তুমি! ফিনা, তুমি!' গডফ্রে স্তম্ভিত।

ইতিমধ্যে ক্যাপটেন টারকটের নির্দেশ পেয়ে দু'জন নাবিক উইল-ট্রির মগডালে উঠে পড়েছে। প্রফেসর টার্টলেটকে তারা যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে, তবে আধ-কাঁচা ফলের মত পেড়ে আনল।

গডফ্রে আবার বিড় বিড় করল, 'মামা? তুমি?'

'হ্যাঁ, দৃষ্টিভ্রম নয়, ঠিকই দেখতে পাচ্ছিস। আমিই।'

'কিন্তু তুমি ফিনা আইল্যান্ডের হদিশ পেলে কিভাবে?'

'ফিনা আইল্যান্ড?' প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন উইলিয়াম ডব্লিউ কোল্ডেরুপ। 'কিসের ফিনা আইল্যান্ড! এই দ্বীপের নাম স্পেনসার আইল্যান্ড। হদিশ পেলাম কিভাবে? এটা কোন কঠিন

প্রশ্ন হলো না। আমার দ্বীপ আমি খুঁজে পাব না তো কে খুঁজে পাবে। এই দ্বীপ আমি ছ'মাস আগে নিলামে কিনেছি।'

'স্পেনসার আইল্যান্ড–মানে?'

'গডফ্রে, তুমি কি এই দ্বীপের নাম দিয়েছ ফিনা আইল্যান্ড?' মিষ্টি সুরে প্রশ্ন করল ফিনা হলানি।

'আমার মেয়ের নামে যখন নামকরণ হয়েছে, এই নামটাই বহাল রাখতে হবে,' কোল্ডেরুপ বললেন। 'তবে দ্বীপটার ভৌগোলিক নাম স্পেনসার আইল্যান্ড। খুব দূরে নয়, সান ফ্রান্সিসকো থেকে মাত্র তিন দিনের পথ। একটু কৌশলে আমিই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছি। ভেবেছিলাম রবিনসন ক্রুসোকে অনুকরণ করার জন্যে এই দ্বীপটাই তোমার জন্যে আদর্শ হবে।'

'কি বললে, মামা? কি বললে? রবিনসন ক্রুসোকে অনুকরণ?' তিক্ত হাসি ফুটল গডফ্রের ঠোঁটে। 'সত্যি কথা বলতে কি, কাজটা তুমি ঠিকই করেছ। কোন সন্দেহ নেই, আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। কিন্তু, মামা–জাহাজডুবির ঘটনাটা?'

'সাজানো নাটক, স্রেফ সাজানো নাটক,' হেসে উঠে বললেন গডফ্রে, তাঁর এমন হাসিখুশি চেহারা আগে কখনও দেখা যায়নি। 'ক্যাপটেন টারকটের ওপর আমার নির্দেশ ছিল, স্বপ্নকে অর্ধেকটার মত ডোবাবার ভান করতে হবে। তোমরা ভাবলে জাহাজটা পুরোপুরি ডুবে গেছে। তোমরা নিরাপদে দ্বীপে উঠেছ, এটা দেখেই টারকট জাহাজের পানি ছেঁচে ফেলে দেয়, তারপর ফুলস্পীডে চালিয়ে সোজা ফিরে যায় সানফ্রান্সিসকোয়–তিন দিনের মধ্যে। এখন আবার উনিই আমাদেরকে স্পেনসার আইল্যান্ডে নিয়ে এলেন।'

'তাহলে নাবিক বা মাল্লারা কেউ মারা যায়নি?'

'না, কেন মরবে! তবে সেই চীনা লোকটার ভাগ্যে কি ঘটেছে তা বলতে পারি না। ওই যে, জাহাজের খোলে যে লোকটা লুকিয়েছিল। পরে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু, মামা, ক্যানুটা? জংলীদের ক্যানুটা?'

'তা-ও সাজানো নাটক। ওই ক্যানুও আমার বানানো। ভাগ্নে, গোটা ব্যাপারটাই আসলে অভিনয়।'

'জংলীরা?'

'ওরা আসলে জংলীই নয়। ওদেরকে আমি জংলী সাজাই। ভাগ্যকে ধন্যবাদ, তোমাদের গুলি ওদেরকে লাগেনি।'

'আর কারেফিনোতু?'

'নাটকের একটা চরিত্র। ওর নাম কারেফিনোতু নয়, জাস ব্রাস। সে আমার অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী। এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি ক্রুসোর ফ্রাইডের ভূমিকায় বেড়ে অভিনয় করেছে সে।'

'তা ঠিক,' মামাকে সমর্থন করল গডফ্রে। 'ভদ্রলোক দু'দু'বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। একবার ভালুকের কবল থেকে, আরেকবার বাঘের কবল থেকে।'

'নকল! নকল! দুটোই নকল! একটাও জ্যান্ত ছিল না।' গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কোল্ডেরুপ। 'দুটোর ভেতরই গাদা গাদা খড় ছিল। জাস ব্রাস আর তার সঙ্গীরা ও-দুটো নিয়েই দ্বীপে ওঠে।'

'কিন্তু নকল হলে থাবা নাড়ছিল কিভাবে?'

'স্প্রীঙ বসানো খেলনা যে! দু'বারই তোমাকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় ওগুলোকে রেখে আসে জাস ব্রাস। হে-হে-হে, সবই অভিনয়, বুঝলে!'

'কিন্তু কেন?'

'বাহ্! দিব্যি নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলে দ্বীপে, উত্তেজনাকর কিছু একটা না ঘটলে ক্রুসোদের মানাবে কেন!'

এবার মামার সঙ্গে ভাগ্নেও হেসে উঠল। 'কিন্তু, একটা প্রশ্ন, মামা। এখানে আমাদের জীবনযাপন তুমি যদি সহজ করতে নাই চেয়ে থাকো, তাহলে প্রয়োজনীয় জিনিস ভর্তি সিন্দুকটা পাঠালে কেন?'

'প্রয়োজনীয় জিনিস ভর্তি সিন্দুক?' কোল্ডেরুপ আকাশ থেকে পড়লেন। 'আমি তো কোন সিন্দুক পাঠাইনি! তবে কি...' কথা শেষ না করে ফিনার দিকে তাকালেন তিনি।

মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকাল ফিনা।

'আচ্ছা, বুঝেছি! তাহলে এই ব্যাপার! ফিনাই কোন লোককে দিয়ে...' কোল্ডেরুপ ক্যাপটেন টারকটের দিকে তাকালেন।

টারকট হেসে ফেলে বললেন, 'মিস ফিনার কথা কি আমি ফেলতে পারি, আপনিই বলুন, মি. কোল্ডেরুপ! চার মাস আগে আপনি যখন দ্বীপে এরা কি করছে জানার জন্যে আমাকে পাঠালেন, তখন ওই সিন্দুকটা...'

'ফিনা! তুমিই তাহলে সিন্দুকটা...?' গডফ্রে হাসছে।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে ফিনা। 'ক্যাপটেন টারকট, আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে ব্যাপারটা গোপন রাখবেন...'

তার কথা শুনে সবাই একযোগে হেসে উঠল।

'কিন্তু কুমিরটা? আপনি কি বলতে চান, মি. কোল্ডেরুপ, আমাকে যে কুমিরটা ধাওয়া করেছিল সেটাও ছিল আপনার পাঠানো নকল কুমির? স্প্রীঙ লাগানো?' এই প্রথম মুখ খুললেন প্রফেসর টার্টলেট।

'কুমির!'

'হ্যাঁ, মি. কোল্ডেরুপ,' বলল জাস ব্রাস ওরফে কারেফিনোতু। 'আস্ত ও জ্যান্ত একটা কুমির সত্যি সত্যি মি. টার্টলেটকে ধাওয়া করেছিল। ওটাকে কিন্তু আমি সঙ্গে করে আনিনি।'

সে থামতেই মামাকে হিংস্র জন্তুদের কথা খুলে বলল গডফ্রে। শুনে কোল্ডেরুপ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবাই জানে স্পেনসার আইল্যান্ডে কোন হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই দলিলেও এ-কথা লেখা আছে—আমিষখোর কোন প্রাণী কখনোই দেখা যায়নি দ্বীপে। কোল্ডেরুপ নিজে ওই দলিল খুঁটিয়ে পড়েছেন।

গডফ্রে এরপর রহস্যময় ধোঁয়ার কথাটাও তুলল। এটারও কোন সমাধান পাওয়া গেল না। কোল্ডেরুপ স্বীকার করলেন, নাটকের প্রযোজক হিসেবে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সারতে পারেননি তিনি। তিনি নিজে যেখানে সব দেখে রায় দিয়েছিলেন যে দ্বীপে কোন হিংস্র প্রাণী বা ব্যাখ্যার অতীত কোন রহস্য নেই, সেখানে সাপ, সিংহ, হায়েনা, চিতা বা ধোঁয়া আসে কোত্থেকে? এ তাঁর এক ধরনের ব্যর্থতা তো বটেই।

প্রসঙ্গটা আপাতত ভুলে থাকলেন তিনি। গডফ্রেকে বললেন, 'দ্বীপ তোমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে, তাই না? সে-কথা ভেবেই এই দ্বীপটা তোমাকে আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন এটাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারো তুমি। যদি চাও, রবিনসন ক্রুসো হয়ে সারাটা জীবন এখানেই কাটিয়ে দিতে পারো, কেউ আপত্তি করবে না।'

'রবিনসন ক্রুসো হব? এই আমি? মামা, মাফ চাই!'

'তাহলে চলো ফিরে যাই সানফ্রান্সিসকোয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি তোমাদের বিয়ে দিতে চাই। কালই আমরা রওনা হতে পারি, কি বলো?'

ঘাড় কাত করে তখুনি রাজি হয়ে গেল গডফ্রে। তারপর সবাইকে নিয়ে বেরুল সে, দ্বীপটা ঘুরিয়ে দেখাবে।

উইল-ট্রির আশপাশে বুনো জন্তুরা কিছুই আস্ত রাখেনি, ভেঙে সব গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ওদের পোষা প্রাণী একটাও বেঁচে নেই,

চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। দলবল নিয়ে কোল্ডেরুপ সময়মত না পৌঁছালে এই ক্রুসোদের কপালে আরও অনেক খারাবি ছিল। 'উইল-মামা,' হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বলল গডফ্রে, 'দ্বীপের নাম তো ফিনা আইল্যান্ড, কিন্তু আমাদের এই আস্তানার নাম কি রেখেছি, জানো? উইল-ট্রি!'

'বেশ-বেশ, খুশি হলাম। উইল-ট্রির বীজ সানফ্রান্সিসকোয় নিয়ে যাব, পুঁতে দেব আমার বাগানে।'

রাস্তা ধরে হাঁটছে ওরা, বুনো জন্তুদের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। অনেক লোকজন দেখে ভয়ে তারা কাছে এল না, ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ল। প্রসঙ্গটা আবার তুললেন কোল্ডেরুপ– এতগুলো হিংস্র জানোয়ার এই দ্বীপে কোত্থেকে এল? অনেক মাথা খাটিয়েও রহস্যটার কোন মীমাংসা পাওয়া গেল না।

রাতটা ওরা সবাই 'স্বপ্নে' কাটাল।

স্বপ্ন রওনা হলো পরদিন, জানুয়ারি মাসের বিশ তারিখে। বেলা আটটার দিকে ডেক থেকে গডফ্রে দেখল দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে স্পেনসার ওরফে ফিনা আইল্যান্ড। বুকটা কি এক মায়ায় টনটন করে উঠল তার। দ্বীপটাকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এই ফিনা আইল্যান্ড ছ'মাসে অনেক কিছু শিখিয়েছে তাকে। সে শিক্ষা অমূল্য, জীবনটাকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে তাকে সব সময় সাহায্য করবে।

স্বপ্ন এবার সোজা পথ ধরে ফিরছে। দিনে একদিকে, রাতে আরেকদিকে নয়। কাজেই সানফ্রান্সিসকোয় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল ওরা। জাহাজ জেটিতে ভিড়তেই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য এক ঘটনা ঘটল। এবার নিয়ে দ্বিতীয় বার জাহাজের খোল থেকে বেরিয়ে এল সেই চীনাম্যান সেংভু।

কোল্ডেরুপের সামনে এসে সেংভু বলল, 'মি. কোল্ডেরুপ,

আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রথমবার আপনার জাহাজের খোলে লুকাবার কারণ ছিল, আমি ভেবেছিলাম স্বপ্ন সাংহাই যাবে। আর এবার স্বপ্ন থেকে নামছি সান ফ্রান্সিসকোয় ফিরে আসতে পারায়।'

তার আকস্মিক আবির্ভাবে সবাই বিমূঢ়। কারও মুখে কথা ফুটছে না।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন কোল্ডেরুপ। 'গত ছ'মাস নিশ্চয়ই তুমি আমার জাহাজের খোলে লুকিয়ে ছিলে না?'

'জ্বী, না, তা ছিলাম না।'

'তাহলে কোথায় ছিলে?'

'দ্বীপে ছিলাম, স্যার। ফিনা আইল্যান্ডে।'

'কি বললে?' গডফ্রে হাঁ হয়ে গেল। 'তুমি দ্বীপে ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমিই আগুন জ্বালতে?'

'হ্যাঁ, আমিই। বেঁচে থাকতে হলে আগুন তো জ্বালতেই হবে।'

'তুমি আমাদেরকে দেখা দাওনি কেন? আমরা তো একসঙ্গেই থাকতে পারতাম।'

সেংভু শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিল, 'চীনারা আসলে একা থাকতেই ভালবাসে। সব চীনাই নিজেকে রক্ষা করতে জানে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে আর কারও সাহায্য আমাদের দরকার হয় না।'

'দ্বিতীয়বার তুমি জাহাজে উঠলে কিভাবে?'

'সাঁতরে উঠি। জানুয়ারি মাসের উনিশ তারিখে।' নুয়ে পড়ল সেংভু, সবিনয়ে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে জেটিতে নামল, তারপর মিশে গেল লোকজনের ভিড়ে।

'রবিনসন ক্রুসো হবার সব রকম যোগ্যতা একমাত্র ওরই আছে,' কোল্ডেরুপ বললেন। 'ওর মত একা একটা দ্বীপে থাকতে পারবে তোমরা কেউ?'

'কঠিন একটা প্রশ্ন, সন্দেহ নেই,' বলল গডফ্রে। 'যাক, অন্তত একটা রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল। ধোঁয়াটা এখন আর কোন ধাঁধা নয়। বোঝা গেল, সেংভুই আগুন জ্বালত। কিন্তু বুনো জন্তুগুলো? ফিনা আইল্যান্ডে ওগুলো কিভাবে এল তা বোধহয় কোনদিনই জানা যাবে না।'

'আর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কুমিরটা?' জানতে চাইলেন প্রফেসর টার্টলেট। মরা কুমিরটাকে ফিনা আইল্যান্ডে রেখে আসেননি, জাহাজে তুলে নিয়েছেন। 'ওটারই বা কি রহস্য?'

উইল-মামা একটু বিব্রতই হলেন। কিন্তু কুমির-রহস্য ভেদ করা এমন কি তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়।

দিন কয়েক পরই খুব ধুমধামের সঙ্গে গডফ্রে আর ফিনার বিয়ে হলো। তারপর একদিন ছাত্র-ছাত্রী আর মি. কোল্ডেরুপকে নিজের বাড়িতে দাওয়াত দিলেন প্রফেসর টার্টলেট।

প্রফেসরের বৈঠকখানায় ঢোকার পর চমকে উঠল সবাই। দূর থেকে দেখে একেবারে জ্যান্ত লাগছে 'স্টাফ' করা কুমিরটাকে। কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ওটাকে–মুখ খোলা, থাবা উদ্যত। গর্ব করে টার্টলেট বললেন, 'এই কুমির আমার এই বৈঠকখানার অলঙ্কার।'

সবাই তাঁর রুচি ও বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগল।

টার্টলেট সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মি. কোল্ডেরুপ, বলতে পারবেন, কুমিরটা দ্বীপে কিভাবে এসেছিল?'

'না।'

'কেন, খেয়াল করেননি, কুমিরটার গলায় একটা লেবেল সাঁটা ছিল?'

'লেবেল সাঁটা ছিল? কি বলছেন!'

'ঠিকই বলছি। এই দেখুন সেই লেবেল,' বলে কোল্ডেরুপের দিকে একটুকরো চামড়া বাড়িয়ে ধরলেন টার্টলেট।

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল চামড়াটা দেখার জন্যে। তাতে লেখা রয়েছে–

'হামবুর্গ থেকে হাগনবেক কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত
জনাব জে. আর. টাসকিনার বরাবরেষু
স্টকটন, আমেরিকা।'

পড়া শেষ হতেই গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কোল্ডেরুপ। এতদিনে সব তিনি বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, এ তাহলে তাঁর চিরশত্রু টাসকিনারের কীর্তি! নিলামে হেরে যাবার পর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। বিভিন্ন দেশের চিড়িয়াখানা থেকে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আনিয়েছেন, তারপর সেগুলোকে জাহাজে তুলে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন ফিনা আইল্যান্ডে। ভেবেছেন, এবার তাঁর শত্রু ঠ্যালা সামলাক! প্রতিদ্বন্দ্বীকে শায়েস্তা করতে গিয়ে অনেক টাকা খরচ করেছেন তিনি।

'সত্যি, লোকটার প্রশংসা করতে হয়,' আবার হেসে উঠে বললেন কোল্ডেরুপ। 'হার মানতে জানেন না। আমার মাথায় কিন্তু এই বুদ্ধি কখনোই আসত না।'

ফিনা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলল, 'কিন্তু ওই দ্বীপে আর তো যাওয়াই যাবে না! হিংস্র প্রাণীদের আমি সাংঘাতিক ভয় পাই।'

'আমরা অপেক্ষা করব,' বললেন উইল-মামা। 'শেষ সিংহটা শেষ বাঘকে খেয়ে ফেলুক, তারপর যাব।'

'ফিনাকে তো ওই দ্বীপে একবার আমি নিয়ে যাবই,' বলল

গডফ্রে। 'কি ফিনা, যাবে তো? নাকি ভয় পাবে?'

'তুমি সঙ্গে থাকলে ভয় পাব কেন?' মিষ্টি গলায় বলল ফিনা। 'যাব বৈ কি, অবশ্যই যাব।'

***

জুল ভার্ন

স্কুল ফর রবিনসন্স

রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

রোমাঞ্চপ্রিয় গডফ্রের ইচ্ছে দুনিয়াটা দেখতে অভিযানে বেরুবে। নাচের শিক্ষক প্রফেসর টার্টলেটকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। কিন্তু ওদের জাহাজ 'স্বপ্ন' দিনে একদিকে যায়, রাতে যায় আরেকদিকে—রহস্যটা কি? জাহাজডুবি ঠেকানো গেল না, সাঁতরে একটা নির্জন দ্বীপে উঠল ওরা। এখানে কোন মানুষ নেই, তাহলে আগুন জ্বালছে কে? কাঠের প্রকাণ্ড সিন্দুকটাই বা কোত্থেকে এল? ওদের আস্তানায় হানা দিল হিংস্র একদল আমিষখোর জন্তু। আশ্চর্য! ওগুলো আসছে কোত্থেকে?

ফিনোত লোকটাই বা কে?

বিশেষ সতর্কবাণী—শেষ পাতাগুলো আগে পড়ে ফেললে কাহিনীটা উপভোগ্য হবে না।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০